



স্বদেশের সাথে প্রবাসের অনন্য মেতু বন্ধন

মেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর'২০



আওয়াড

মারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্টঃ দ্য নিউ নরমাল

ঈশ্বরের মাটিতে বিজয় দিবস উদযাপন

শীতল চাচা, আমাকে ক্ষমা কর

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক	: মোঃ বশীর উদ্দীন খান
সহকারী সম্পাদক	: মারুফ হাসান নামিম নুজহাত ফারহানা
সম্পাদনা সহকারী	: ইফতে খাইরুল হক ইমন ইরফান নাদের মুহতামিম রহমান
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	: মোঃ মাহাবুল হক মোহাম্মদ তৌহিদ এ. এ. এম মুজাহিদ
গ্রাফিক্স ডিজাইন	: হাছান আহমেদ

প্রকাশনা ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষণ

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা



www.bcysa.org

www.facebook.com/bcysa2018

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সূচীপত্র

০১.	আওয়াজ	০৫
০২.	সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট : দ্য নিউ নরমাল	০৭
০৩.	চীনের মাটিতে বিজয় দিবস উদযাপন	০৮
০৪.	শীতল চাচা , আমাকে ক্ষমা কর	১০
০৫.	কনফুশিয়াসের চারটি শিক্ষামূলক গল্প	১১
০৬.	মিনচিয়াং-চীনের এক অজানা জনপদ	১৩
০৭.	四大名著: চায়নার মেরা চারটি উপন্যাস	১৫
০৮.	ইউয়েলু অ্যাকাডেমি	১৭
০৯.	তৈল প্রদীপ	১৮
১০.	চলতে পথে আমার দেখা চীনা প্রযুক্তি	২০
১১.	My China Story	২৩
১২.	কবিতা	২৫
১৩.	গুয়াংজু শহরে অবস্থিত ১০ টি দর্শনীয় স্থান	২৬
১৪.	চাইনিজ মালাদ রেমিপি	৩২
১৫.	ফটোগ্রাফি	৩৩
১৬.	সংবাদ	৩৪



বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক মেলবন্ধনের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে একদল উদ্যমী তরুণ গবেষকের হাত ধরে বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ চার বছরের অধিক সময় ধরে সহস্রাধিক সদস্য ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি তার সাবলীল পথচলা অব্যাহত রেখেছে। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক এ প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞান ও গবেষণা নির্ভর সমাজ কাঠামো গঠন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে একটি অনন্য ও সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সবসময় সচেষ্ট থেকেছে।

অ্যাসোসিয়েশনের এই পথচলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন অনলাইন ভিত্তিক বাংলা ম্যাগাজিন ‘মহাপ্রাচীর’। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ ম্যাগাজিনটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে ম্যাগাজিনটির তিনটি সংখ্যা সফলভাবে প্রকাশিত হয়েছে যা সুধীমহলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। এছাড়াও সংগঠনটির পৃষ্ঠপোষকতায় ‘বিসিওয়াইএসএ নিউজ’ নামে একটি অনলাইন সংবাদ পোর্টাল উন্মুক্ত হয়েছে যেখানে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংবাদ পোর্টালটিতে নিজস্ব উৎস থেকে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্যাম্পাস প্রতিনিধি নির্বাচনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার কারণে পাঠকসমাজ নিউজ পোর্টালটি থেকে আরো ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

করোনা পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থাকে অভিহিত করা হচ্ছে ‘নিউ নরমাল’ বা ‘নব্য স্বাভাবিকতা’ হিসেবে। সাধারণত কোন বড় বৈশ্বিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনকে ইংগিত করতেই এ প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। করোনা পরবর্তী এই নব্য স্বাভাবিকতাকে উপজীব্য করে আমরা আমাদের ম্যাগাজিনের এই চতুর্থ সংখ্যাটি প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছি। ম্যাগাজিনের বর্তমান সংখ্যার প্রকাশ তাই আমাদের সংগঠনটির দৃষ্ট পদক্ষেপে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বাংলাদেশ ও চীনের ভাষা ও সংস্কৃতির বিনিময় অব্যাহত রাখতে বিশ্বমহামারীর সময়েও আমরা আমাদের এ ম্যাগাজিনটির প্রকাশ অব্যাহত রাখতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। আশা করছি প্রতিবারের মত এবারেও ম্যাগাজিনটি যথেষ্ট পাঠক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। ম্যাগাজিনের এ সংখ্যাতেও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। বরাবরের মতই এটি আমার জন্য অত্যন্ত গৌরব ও সম্মানের।

ম্যাগাজিনের এ সংখ্যায়ও সম্মানিত লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সাড়া আমাদের অভিভূত করেছে। সম্পাদকীয় নীতিমালা অনুসরণ ও কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে এ সংখ্যায়ও অনেকের লেখা প্রকাশ না করতে পারায় সম্মানিত পাঠকদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। লেখা সংগ্রহ থেকে শুরু করে সংকলন ও সম্পাদনা অনেক দুরূহ ও জটিল ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া সংগঠনের সভাপতি ও উপদেষ্টা পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণসহ সবাই এই ম্যাগাজিন বের করতে তাদের সময়, শ্রম, মেধা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাদের সবার প্রতি আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ করছি। ম্যাগাজিনটি নির্ভুলভাবে প্রকাশে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এতে অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ বিষয়ে পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের যেকোনো পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

করোনা মহামারীর আবির্ভাবের পর দ্বিতীয়, তরঙ্গ মোকাবেলার সংগ্রামে কার্যকরী প্রতিষেধক উদ্ভাবনে সমগ্র বিশ্ব আজ একাত্ম হয়েছে। এই একাত্মতা মানবিকতাকে শাণিত করে বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপলক্ষ হয়ে উঠুক - বিশ্বমহামারীর আবির্ভাবের বছর পূর্তিতে এই আশাবাদ রাখছি। মানবিকতা হয়ে উঠুক মানুষের প্রধানতম বিবেচ্য বিষয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে সবাই সমান মর্যাদা পাক এই কামনায় শেষ করছি।

১৬ নভেম্বর, ২০২০

সাংহাই, চীন।

বিনীত
মোঃ বশীর উদ্দীন খান
সম্পাদক

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

আওয়াজ

রাত তিনটা বাজে, রাহেলা বেগমের চোখে ঘুম নেই। মশারীর মধ্যে বসে আছে, ভ্যাপসা গরমে জীবন অতিষ্ঠ। চৈত্র মাসের এই কাঠফাটা রোদের শেষে রাতগুলো খুব ভয়ংকর রকমের অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই শেষ রাতে বিঁবিঁ পোকাকার একটানা ডাক আর দূরে দুই-একটা শেয়ালের হুন্কাহুন্কা ডাক ছাড়া কিছু শোনা যায় না। আগের থেকে এই রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার অভ্যাসটা এখন বেশি হয়েছে, বয়সও তো কম হলো না। প্রায় ৬০ এর ঘর ছুঁই ছুঁই। আসলে আজ ঘুমটা ভাঙছে অন্য কারণে, আকাশ তার বন্ধুর সাথে মাছ ধরতে বের হয়েছে একটু আগে। তাই টেনশনে তার ঘুম আর হয় নি। আকাশের বন্ধুর নাম রেশপ, পুঁব পাড়ায় থাকে। দুই জনের গলায় গলায় মিল। হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ নাই, একসাথে যা পাবে তাই খেয়ে ফেলে দুইজনে। বয়স ২০ এর কাছাকাছি হবে দুইজনের। পড়ালেখা আকাশের কপালে জোটেনি। বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলেটা একবারে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। বাপমরা ছেলে দেখে মায়ের ভয়ে অন্য কোন ভাই-বোনেরা কিছু বলতে পারে না। তাহলে তার আর রক্ষ নেই। এই তো সেদিন বড় বড় কাঁকড়া রান্না করে দুইজনে দিব্যি খেয়ে ফেলে-লা। এই ‘খাস নে, খাস নে’ বলে চিৎকার করতে থাকে রাহেলা বেগম। কে শোনে কার কথা! নাড়িছেঁড়া সন্তানকে কিছু বলতেও পারে না, অসময়ে জন্ম নেওয়া ছেলে হলে যা হয়। সারাদিন টে টে করে ঘুরে বেড়ায় এপাড়া সে পাড়া।

এই যে এত রাতে বেরিয়ে গেলো, এত নিষেধ করার পর ও শুনলো না ছেলেটা। তাই আর ঘুম আসলো না। এত রাতে যাওয়ার কী দরকার ছিলো, সেটাই বুঝতে পারছে না। মনে মনে রাহেলা বেগম বলে উঠলো “এই বুড়ো বয়সে আমার হয়েছে যত জ্বালা”। ও দিকে আকাশ বুঝতে পারছে না রেশপ এত পিছনে কী করে পড়ে গেলো। আকাশে এখনও থালার মত চাঁদ নিঃশব্দে আলো দিয়ে যাচ্ছে। তারপর ও এই মিয়াবাড়ির গোরস্থানের সামনে আসলে কেমন গাটা হুমহুম করে ওঠে। যদিও আকাশ নিজেকে অনেক সাহসী বলে মনে করে। আর রেশপ তো আছে ওর সাথে, ভয় কীসের, এই বলে মনটাকে সাহস দিলো। কিন্তু এত রাতে রেশপ কেন মাছ ধরতে বের হলো তাই আকাশের মাথায় আসছে না। যাওয়ার কথা ছিলো আযানের পর, এখনও আযান পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। উফ! কী একটা গা হুমহুমে ভাব, চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কোন আওয়াজ নেই। মাঝে মাঝে হুতুমপ্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে, আর কিছু নয়। এমন সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পথ চলছে আনমনে। হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়লো, মা আজ অনেক বার নিষেধ করেছে এত রাতে না আসার জন্য, মা যেদিন মানা করে সেদিন কোন না কোন বিপদ ঠিকই হয়। মা যেন কেমন করে সব বুঝে যায়। হঠাৎ কাঁধের কাছে কারও হাতের স্পর্শ পেলো, কেউ যেন কানের কাছে টেনে টেনে বলে গেলো “আকাশ, আরও তাড়াতাড়ি চল” গলাটা অদ্ভুত শোনালো। ভয়ে চমকে উঠে পেছনে তাকালো, প্রথমে ভাবলো রেশপ, পরে দেখলো না, রেশপ তার থেকে কমপক্ষে ১০ হাত দূরে হাঁটছে। তাহলে একটু আগে ওভাবে ডাকলো কে!! আর ঐ আওয়াজ!! ঐ টাই বা কিসের!! ভয়ে রাগে ‘রেশপ’ বলে জোরে ডাক দিলো। রেশপ বললো, ‘কী রে দোস্ত, কী হয়েছে? চল চল, এখনও অনেক টা রাস্তা যেতে হবে’। ‘না, রেশপতো ঠিকই আছে, তাহলে??’ পরক্ষণে মনে হলো, আরে এটা মনের ভ্রম, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে চাঁদ কিছুটা হেলে পড়েছে, এখনও রাত আছে, আযান দেয় নি। এত রাতে আসাটা ঠিক হয় নি, এখন কি মাছ দেখা যাবে! এই সব ভাবতে ভাবতে একটা বিড়ি ধরালো। রেশপ বিড়ি খুব পছন্দ করে, কি জানি ছেলেটা আজ ওর পেছনে পেছনে হাঁটছে কেন? ‘এই রেশপ বিড়ি খাবি’ সে বললো, ‘না, তুই খা, এখন ইচ্ছে করছে না’। আবার আকাশ হাঁটতে লাগলো বিড়ি টানতে টানতে।

হাঁটতে হাঁটতে মিয়াবাড়ির রাস্তা ছাড়িয়ে বিলের রাস্তায় এসে পড়লো। মায়ের কাছে শুনেছিলো, এটা নাকি আগে রাস্তা ছিলো না, বড় একটা নালা ছিলো। আর এই নালার পাশের মাঠ দিয়ে মুণ্ডুকাটা ঘোড়া গভীর রাতে ছুটে যেতো। অনেক সময় অনেকের নাম ধরে ডাকতো, যদি কেউ সাঁড়া দিতো, তাহলে পরদিন তার লাশ পাওয়া যেতো ঐ নালাতে। এখনও রাতের বেলা কেউ দূর থেকে ডাকলে, কেউ উত্তর করে না। যাই হোক, রেশপটা কেন যে এত পিছু পিছু হাঁটছে বুঝতে পারছে না। নাহ, গাটা কেমন জানি হুমহুম করছে। ভাবতে ভাবতে খালের ধারে এসে পড়লো, এই সেই গর্তটা! কাল এসে দুইজনে দেখে গেছিলো, বেশ মাছ আছে। একবারে ছোপের মুখে, উজানে ট্যাংরা, পুটি, চিংড়ি ভালোই উঠে আসে খাল থেকে। হঠাৎ থেমে গেলো, “আঁই রেশপ, তাড়াতাড়ি আয়”, ফিসফিসে গলায় ডাকলো আকাশ। কিন্তু সে আসলো খুব আনমনা ভঙ্গিতে, যদিও মাছের ধারে এসে ওর চোখ চকচক করে উঠলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ও সব মাছ কাঁচা খেয়ে ফেলবে। তারপর হুড়মুড় করে গর্তে নেমে পড়লো। আকাশ বললো “কী রে বন্ধু, এখন বুঝলি তো কেন তোকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলাম”। মাছ মারার জন্য দুইজনের কাছে দুইটা খারা (বাঁশের বোনা ঝুড়ি) আর বর্শা আছে। গপাগপ মারছে আর পেছনে বাঁধা খারায় রেখে দিচ্ছে। মনে মনে ভাবছে রাত থাকতে এসেই ভালো হইছে। চাঁদের আলোয় চকচকে পানিতে বেশ পরিষ্কার মাছগুলোকে দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে সুন সান, কোন আওয়াজ নাই, শুধু ফলার শব্দ, আর মাছ ধরার আওয়াজে মুখরিত। আকাশ ভাবছে আজ অনেক টাকার মাছ বিক্রি হবে। তারপর দুই বন্ধু মিলে বিকালে সিনেমা দেখতে যাবে। এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে মনে নেই। হঠাৎ আকাশের খেয়াল হলো এতক্ষণে তো খারা ভরে যাওয়ার কথা, কিন্তু ভরছে না কেন!! খারায় হাত দিয়ে দেখলো মাছও বেশি না। “আরে রেশপ” এত মাছ ধরলাম কৈ গেলো রে? রেশপ আগের থেকে গভীরমুখে বললো “আমি জানি না”। আওয়াজ তার এই প্রথম বেশ ভারী শোনালো। আকাশ ভাবলো বন্ধু মনে হয় রাগ করেছে। “আরে শোন না দোস্ত, আমি এমন বললাম। কিছু মনে করিস না”। আবার মাছ মারতে শুরু করলো। চাঁদটা এখন কিছুটা হেলে পড়েছে, ফজরের আযানের সময় হয়েছে বোধহয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলো আকাশ। হঠাৎ একটা বিন্দুটে আওয়াজ শুনলো আকাশ, তার ঠিক পেছনে। কচমচ করে, ঠিক যেন কাঁচা মাছ খাওয়ার আওয়াজ। এবার আকাশের সন্দেহ হলো, সে চুপ করে পেছনে না ফিরে কান পেতে থাকলো। হ্যাঁ, সেই আওয়াজটা এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ঠিক তার পেছন থেকে শব্দটা আসছে। হালকা আড় চোখে তাকালো আকাশ, তারপর.....

তারপর যা দেখলো, তার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলো না আকাশ। তার শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা অনুভব করলো, মনে হলো এত ভ্যাপসা গরমের মধ্যেও একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেলো। হাত-পা অবশ হয়ে আসলো। সে দেখলো, তার বন্ধু কাঁচা মাছ কচমচ করে চিবিয়ে খাচ্ছে আর দু'গাল বেয়ে মাছের টাটকা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ মনে হলো এ গুর বন্ধু রেশপ নয়, এটা মাছখেকো ডাইনী। মায়ের কাছে শুনেছে ছোটবেলায়, এরা নাকি যে কারও রূপ নিয়ে আসতে পারে। তাই তো এত রাতে ওকে ডাকতে এসেছিলো, পেছনে পেছনে হাটলো, বিড়ির আঙনের ভয়ে দূরে দূরে রইলো। সব দু'য়ে দু'য়ে চার মিলে গেলো। সে ডাইনীর খপ্পরে পড়েছে। কী করবে সে এখন.... ডাইনীটা পিছনে অনবরত মাছের ঘাড় মটকে খেয়ে যাচ্ছে। তাইতো মাছ এত কম!! এক মুহূর্তের জন্য আকাশের মনে হলো বাঁচতে হলে ওকে মারতে হবে তা নাহলে ও বেঁচে ফিরতে পারবে না। এই ভোর রাতে ফাঁকা বিলে একটা পাখিও নেই। মুহূর্তের মধ্যে খুব অসহায় মনে হলো আকাশের। মনে মনে ভাবলো একবার ডাইনীটা ওর দিকে তাকালে হয়, চোখ বরাবর মারবে বর্ষাটা, তাই যা থাকে কপালে। হঠাৎ মাছ নেওয়ার জন্য পেছন ফিরে আকাশের খারার দিকে হাত বাড়ালো, আর দেখলো আকাশ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্ত দেরি করলো না আকাশ, ঠিক চোখ বরাবর ফলাটা ছুড়ে মারলো। সাথে সাথে ডাইনীটা পানিতে লুটিয়ে পড়লো বিকট এক চিৎকার করে। ফজরের আযান পড়লো। এর মধ্যে রেশপ, আকাশ দের বাড়িতে গিয়ে “আকাশ, আকাশ” বলে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো। আকাশের মা, ওয়ু করছিল। “অ্যাঁই তুই না বেইন্যা রাইতে আইস্যা আকাশেরে লইয়া গেলি? আবার চিল্লাস ক্যান? কী কন কাকিমা! কই আমি তো এখনি আইলাম”। ‘কী কস, তয় আমার পোলাডারে কেডায় লইয়া গেলো’। রেশপ কিছু না বলে বিলের দিকে ছুটেতে লাগলো। আকাশের মা পাগলের মত চিৎকার দিয়ে উঠলো, “ওরে তোরা কে কই আছস এদিকে আয়, আমার পোলাডারে কেডায় লইয়া গেছে বেইন্যা রাইতে”।

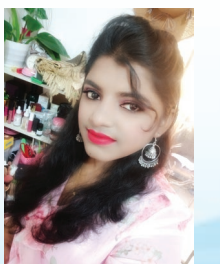
ঐ দিকে আকাশ পাগলের মত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, সবকিছু ফেলে রেখে। রাস্তায় রেশপের সাথে দেখা হয়ে গেলো। বন্ধুকে দেখে জানে পানি ফিরে আসলো। জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো, “তুই কই ছিলি রে? আমি তো মারা যাইতাম রে বন্ধু”। রেশপ বল কী হইসে আমারে খুলে বল! আকাশ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে এ বলে দিলো।

বললো এমন ‘আওয়াজ’ আমি জীবনেও শুনি নাই রে বন্ধু। কাঁচা মাছ খাওয়ার বিভৎস চেহারার আওয়াজ। ‘আচ্ছা ঠিক আছে চল যাই তো দেখে আসি, কী দেখেছিস তুই। চল যাই’। “না বন্ধু আমার ভয় লাগছে চল বাড়ী ফিরে যাই”। “আরে আমি তো আছি, ভয়ের কী আছে। আর এখন তো আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঐ দ্যাখ সবাই মাঠে কাজ করতে আসছে। আর তুই যে মাছ ধরার সব জিনিস পত্র ফেলায় রেখে আসছিস ঐগুলো তো আনতে হবে। চল আমার সাথে বেটা কিচ্ছু হবে না’। আকাশ বললো ‘আচ্ছা চল’। তারপর যখন তারা নালার ধারে পৌঁছালো দেখলো একটা মরা কাকের পিঠে একটা মাছ ধরা বর্ষা ফুটে আছে। এই দেখে রেশপ খিলখিল করে হেসে দিলো। আরে তুই এই দেখে ভয় পাইছিস। আকাশ বেশ অবাক হলো, “আরে কী বলিস, আমি স্পষ্ট দেখেছি, বন্ধু বিশ্বাস কর”। এটা এমন হলো কি করে! ‘আচ্ছা হইসে হইসে এখন এই মরা কাক সহ নিয়ে চল, বাসার সবাইকে দেখাতে হবে না, তুই কত বাহাদুর, ডাইনী মেরেছিস”। আকাশ কেন যেন কিছু মেলাতে পারছে না। এটা কীভাবে সম্ভব! দুই বন্ধু কাঁধে হাত দিয়ে হাটতে হাটতে বাড়ীর পথ ধরলো। হঠাৎ রেশপ বলে উঠলো, আচ্ছা শোন না আকাশ ঐ টা যদি সত্যি আমি হতাম। তাহলে কী করতিস। “আরে ছাড়তো! আমি জানতাম তুই ঐ টা না। তুই আমার জানের দোস্ত না, তোকে মারবো আমি! পারলে জান দিয়ে দিবো”। হঠাৎ বাসার কাছাকাছি এসে রেশপ বললো, “তুই বাড়ি যা, আমার একটু কাজ আছে”। আকাশ বললো, “ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি চলে আসিস, মাছ ধরা তো হলো না। বিকালে মুভি দেখতে যাবো”। তারপর বাড়ী এসে আকাশ চুপি চুপি কাকটাকে রান্না ঘরের পেছনে ফেলে দিয়ে আসলো। রাহেলা বেগম ছেলে কে দেখে কান্নার থেকে বেশি ঝড়ের মত গালি শুরু করে দিলো। আকাশ রাতের ঘটনা মা কে কিচ্ছু বললো না। চুপচাপ গোসল করতে পুকুর ঘাঁটে চলে গেলো। মনটা কেমন জানি খালি খালি লাগছে। কারও সাথে ঝগড়া করতে ভালো লাগছে না। অন্য সময় হলে মাকে দুয়েক কথা শুনিয়ে দিত, আজ কিচ্ছুই বললো না। দুপুরে খেয়ে শুয়ে আছে, রেশপের জন্য অপেক্ষা করছে, সিনেমা দেখতে যাবে। হঠাৎ পুব পাড়া থেকে রীনির মা এসে ‘আকাশ, এই আকাশ’ বলে চিৎকার করে উঠলো। রীনির মার গলা একবারে ঝুনা নারিকেলের মত ঝনঝনে। একবার কারও সাথে ঝগড়া লাগলে হয়। আকাশের মা বললো, “কী রে বউ চিল্লাস ক্যান? কী হইসে?”। আকাশও ঘর থেকে বাইরে এসে বললো ‘কী হলো গো ভাবী, দেওয়ার জন্য পরাণ পোড়ে কেন, এই ঠিক দুপুরে? “আরে আকাশ তুই কিচ্ছু জানিস না! আরে রেশপ কাল সদর থেকে আসার পথে বাস অ্যাস্ট্রিডেন্ট হয়েছিলো। ফজরের আযানের আগে মারা গেছে। লাশ মর্গের থেকে এখন নিয়ে আসবে। রেশপের মা বেহুঁশ হয়ে গেছে। বাবা পাগলপ্রায়। ওর বোনটা বললো কানতে কানতে তোকে একটু খবর দিতে, চল তাড়াতাড়ি”। আকাশের মনে হলো পায়ের নিচে মাটি নেই। একবার মায়ের দিকে তাকালো। রাহেলা বেগম ফ্যাল ফ্যাল করে বিস্ময় দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলো। রীনির মা টানতে টানতে আকাশকে নিয়ে গেলো। বন্ধু, জানের দোস্ত, শুয়ে আছে বিছানায়, সবাই বলছে দেখাযাবেনা। দেখলে ভয় লাগবে। হাজার কান্নার আওয়াজের ভীড়ে, আকাশের আজ ভোরবেলার আওয়াজটা এখনও কানে আসছে।....মাছের কচমচ করে খাওয়ার আওয়াজ, বর্ষার ফলা চোখে খঁচ করে বিঁধে যাওয়ার আওয়াজ.....

প্রায় ছয় মাস হয়ে গেলো রেশপ চলে গেছে, এখন আর রাতে বাইরে যায় না, মায়ের সব কথা শোনে আকাশ। ভাইয়ের সাথে ব্যবসায় সাহায্য করে। সব কিচ্ছু ঠিক ঠাক চলছে, মাও খুব খুশি ছেলের এই পরিবর্তন দেখে। কিন্তু এখনও গভীর রাতে আকাশের ঘুম ভেঙ্গে গেলে, সেই আওয়াজটা মনে পড়ে, বন্ধুকে বলতে শোনে, “আচ্ছা দোস্ত ঐ টা যদি সত্যি সত্যি আমি হতাম, তুই কি মারতে পারতিস”।

শিরিন আক্তার
পিএইচডি গবেষক

চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব অ্যাগ্রিকালচারাল সায়েন্স
হাংচৌ, চচিয়াং, চীন



সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট দ্য নিউ নরমাল

‘সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট’ শব্দ ক’টা সাজিয়ে গিয়েছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সার। শুনলেই কেমন একটা আশির্বাদের মত শোনায়! কিন্তু করোনার এই দুর্যোগকালে এই শব্দবিন্যাস কি আসলেই আশির্বাদকে নির্দেশ করে? নাকি এটা ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন হবার লক্ষণ! যা বলেই ডাকি না কেন, এটাই এখন নরমাল। দ্য নিউ নরমাল! প্রায় এক বছর হতে চলল, পৃথিবী এক দারুণ দুর্যোগে পড়েছে! কী এক ভাইরাস এসে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে জীবনের নিশানা! ইতিহাসে বারবারই ঘটেছে এ দুর্যোগ। তবে মানবসভ্যতার উৎকর্ষের এমন ‘ফিটেস্ট’ পর্যায়ে এসেও যে এমন করে ‘সারভাইভাল’-এর পরীক্ষা দিতে হবে, তা বোধ হয় আমরা কেউই আগে ভেবে দেখিনি!

শুরুতে যখন উহান থেকে খবর এল নতুন এক জীবন সংশয় ঘটানো ভাইরাসের আবির্ভাবের, বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম গুজব! মাত্র এক সপ্তাহ আগেই দেশে ফিরেছি। মাসখানেক পরেই ফিরে যাবার ইচ্ছে। অনেক কাজ বাকি যে! এমন করে ভাইরাস ছড়ালে কী করে হবে!

না, গুজব তখন সিরিয়াস। খুব ভয়, খুব আফসোস আর খুব মন খারাপের মিশেল একটা অনুভূতি তখন কাজ করছে মনে। তখন থেকেই জানতাম, এ ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচবে না কোন দেশই। একটা দুঃস্বপ্নের মত লাগত সবকিছু। ঢাকার বাতাস বিষাক্ত জেনে কিছু মাস্ক কিনে এনেছিলাম, সে মাস্ক যে এখন অন্য কারণেও কাজে লাগাতে হবে ভাবলেই পাগলের মত লাগত। মনে মনে ভাবতাম, এ জিনিস আমার দেশে প্রবেশ করলে রাশত্ভাষাটে পড়ে থাকবে লাশ, অভাবে রান্নার চাল থাকবে না অনেক ঘরে, আর কোনদিন মনের সুখে ঘুরে বেড়ানো হবে না, পারব না বন্ধুকে জড়িয়ে ধরতে কিংবা থামবে না লকডাউন! চায়না ফেরা তো দূর-কি-বাত!

কোভিড-১৯ বাংলাদেশেও এসেছে। ফলাফল যা হবার, হয়েছেও তা-ই। না, রাস্তাঘাটে লাশ পড়ে থাকতে দেখার মত দুর্ভাগ্য হয় নি, কিন্তু হারিয়ে ফেলা প্রিয় মুখগুলোকে আর কোনদিনও খুঁজে পাব না। আমরা যারা টেবিলে নিত্যদিন নানাপদের সমারোহে এখনও আগের মতই ঝোলে-অম্বলে ভালই আছি, তারা কোভিডের আকালে হঠাৎ কাজকর্ম হারিয়ে ফেলা দুর্ভাগাদের হাহাকার কোনদিনও টের পাব না!

তবে কোভিডের কিছু আশির্বাদও কিন্তু আমরা দেখতে পাই। লকডাউন উঠে গেছে অনেকদিন। অনেকদিন কাজকর্ম বন্ধ থাকায় ক্ষতিও হয়ে গেছে বেশ। কিন্তু বাইরের পণ্য আমদানি বন্ধ থাকায় দেশি পণ্যের দিকে নতুন করে ঝুঁকেছে উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা। লকডাউন ও লকডাউন পরবর্তী সময়ে এখনও পর্যন্ত ঠিক কতজন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে, তার কোন জরিপ হয়েছে কী না, তা আমার জানা নেই। তবে কথার কথা বললে বলা যায়, আজকাল ১০ ঘরে খোঁজ করলে ৭ ঘরেই দেশী পণ্যের উদ্যোগ খুঁজে পাওয়া যাবে। জামদানী, মণিপুরী, টাঙ্গাইল, গামছা, মধু, সরিষা, পিঠা, ঘরে বানানো খাবার, আয়ুর্বেদিক, চর্মশিল্প, ডিজাইনার জামাকাপড়, ফ্যাশন পণ্য, হস্তশিল্প কী নেই! এর মাঝে কত ব্যবসা টিকে থাকবে, বা এখনও ঝরে পড়েনি, সেটা কথা নয়। দেশী পণ্য তার হারানো গরিমা ফিরে পাচ্ছে, এর বেশি আনন্দ আর কীসে হতে পারে?

ইনোভেশনও আজ কম হচ্ছে না। আজকাল অনলাইনে পড়াশোনা করছি আমরা সবাই। অন্তর্জালের এত অর্থবহ ব্যবহার এর আগে কখনো ঘটেনি। এদিক মাথায় রেখে শিক্ষাখাতে প্রচুর নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করছে তরুণ উদ্যোক্তারা। স্বাস্থ্যখাতেও ইনোভেশন এগিয়েছে সমান তালে। চিকিৎসাসেবা কিংবা ঔষধশিল্পও আজকাল অনলাইনভিত্তিক হয়ে উঠেছে বেশ ভালভাবেই।

সারাবিশ্ব যেখানে ই-কমার্সে এগিয়ে চলেছে, বাংলাদেশ যেন এতকাল একটু পিছিয়েই ছিল। তবে এখন ‘বুম’ হয়েছে কথাটা বোধ হয় বলাই যায়। এফ-কমার্স ব্যবসায়ীরা আজকাল ই-কমার্সের দিকে ঝুঁকছেন বেশ আগ্রহ নিয়েই। নামকরা সাইটগুলোর কথা আর নাই-বা বললাম। দুর্নাম থাকতে পারে অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু কোভিডের সুযোগ কাজে লাগিয়েছে সবাই-ই। তাতে মন্দ হয়নি আদতে।

অনলাইন ব্যবসায় এগিয়ে যাবে আর ডেলিভারি সার্ভিসের উন্নতি হবে না, তাই কি হয়? সুফল আমরা সবাই-ই পাচ্ছি কিন্তু! জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় সব পণ্য, আর্ট হয়ে উঠেছে পেইন্ট সিস্টেমও। ডেলিভারি ম্যানের হাতের ছোঁয়া লাগবার ভয় ছাড়াই এক ক্লিকে পেয়ে যাচ্ছেন কেনাকাটার সুখ। দুর্যোগের মুখে আর কী চাই?

মজার বিষয় হচ্ছে, আজকাল ‘বিগ ফ্যাট ওয়েডিং’ কনসেপ্ট বদলে যেতে শুরু করেছে ঘরোয়া আয়োজনে! বাংলাদেশি বিয়েশাদির আনন্দ স্নান করে দিতে পারেনি প্যানডেমিক, কিন্তু আমূল বদলে দিয়ে গেছে অভ্যাস! আর তাতে বোধ হয় বেজার নন কেউই। হালকা ভীড়বাটার ঝুঁকিটুকু বাদ দিলে এই ঘরোয়া আয়োজনে দরকারি কাজটুকু সেরে নেয়ার আইডিয়াটা কিন্তু বেশ ছিমছাম আর আর্ট! কী বলেন? এবার কিছু সত্যিকারের আশির্বাদের কথা বলি।

কোভিডের একদম প্রাক্কাল থেকেই দেবদূতের মত কিছু স্বেচ্ছাসেবক দল কাজ করে যাচ্ছে দুর্যোগের দুর্ভোগে পড়া মানুষদের জন্য। মানুষ ও পশুপাখির নিয়মিত খাবারের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে কাজ হারিয়ে বসে থাকা দুস্থ কারুশিল্পী, বইবিক্রেতাদের পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে দেবার মত মহতী উদ্যোগে আমরা পাশে পেয়েছি ‘পাশে আছি ইনিশিয়েটিভ’, ‘বিদ্যানন্দ’, ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’ এর মত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে। সর্বস্তরের সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষেরা এসব উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নিয়মিত সাহায্য প্রদান করে গেছেন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য। সভ্যতার চরম এক দুর্যোগকালে মানুষই মানুষের পাশে দাঁড়াবে, এ যেন অকল্পনীয় হয়েও খুব বেশি সত্য!

নিউ নরমাল এখন আর মাস্ক পরা, হাত ধোয়া আর জনসমাগম এড়িয়ে চলার মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই। সারভাইভালের পাল্লায় পড়েই আমরা তৈরি করছি ‘নিউ নর্ম’! ঝুঁকি সামলে, নতুন নতুন পন্থা বের করে, কোভিডের সাথে পালা দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই এখন ‘দ্য ফিটেস্ট’-দের সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজি। প্রতিষেধকের লভ্যতা ছাড়াই এতটা পথ পাড়ি দিয়েছে যারা, তাদেরকে তো ফিটেস্টই বলবেন, নাকি? এই ফিটনেস ধরে রাখুন, কোভিড প্রটোকল মেনে চলুন। বাঁচতে দিন আর বাঁচুন!

নুজহাত ফারহানা
শিক্ষার্থী, চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি
ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়, খুনমিং, ইউনান, চীন



শীলয় মাটিছ বিজয় দিবস উদযাপন

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছিল একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড-বাংলাদেশ। ৪৯ বছর আগের এই দিনে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বিজয়ের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয়েছিল জাতীয় স্বাধীনতা; ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম আর কোটি কোটি মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় এই বিজয়। প্রতি বছর এই দিনটিতে বাংলাদেশিরা তাই বিনম্র শ্রদ্ধা-সম্মান আর ভালোবাসায় গভীরভাবে এই বীর সন্তানদেরকে স্মরণ করে থাকে।

১৬ই ডিসেম্বর ২০২০ উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও চায়নাতে অবস্থানরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের সাথে বিজয় দিবসকে গভীর শ্রদ্ধা আর আনন্দের সাথে উদযাপন করেছে। যদিও এ বছর করোনা মহামারির কারণে অধিকাংশ বাংলাদেশী শিক্ষার্থী চীনের বাইরে অবস্থান করায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধুমাত্র ক্যাম্পাসে অবস্থানরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা স্বল্প পরিসরে দিনটি পালন করে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে নানা কর্মসূচীর আয়োজন করা হয় মহান বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে।

চলুন দেখে আসি কেমন ছিল চীনের বিজয় দিবসঃ



টানের খুনমিং থেকে ডাঃ আরিফুল হক জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে বরাবরের মত এবারও নানা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে খুনমিং কনসালুটে জেনারেল অফিসে পালিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস।

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হওয়া এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কনসুলেট জেনারেল এ. এফ. এম. আমিনুল ইসলাম, ভাইস কনসুলেট জেনারেল মোঃ মিজানুর রহমান এবং অন্যান্য অতিথিবন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও মোনাজাত করা হয়।

এরপর মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পৃথক পৃথক বাণী পাঠ করেন মাননীয় কনসুলেট জেনারেল এ. এফ. এম আমিনুল ইসলাম ও ভাইস কনসুলেট জেনারেল মোঃ মিজানুর রহমান।

এক পর্যায়ে, খুনমিং এ অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে খাবারের ব্যবস্থাসহ পারস্পরিক মতবিনিময় এবং সবশেষে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

চীনের সিচুয়ান থেকে মাহমুদুল হাসান হৃদয় জানিয়েছেন, অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে চীনের সিচুয়ান প্রদেশের ছেংদু শহরে MHR Global Pvt. Ltd. ও Hello Dhaka Restaurant এর উদ্যোগে উদযাপিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মাহমুদুল হাসান হৃদয়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, MHR Global Pvt. Ltd, প্রতিষ্ঠাতা, Hello Dhaka Restaurant ও আলোচনা করেন জনাব আবদুল হাই, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, Hello Dhaka Restaurant, সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সিচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সিচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি চীনা, জার্মান ও আফ্রিকান ব্যবসায়ীসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কিত এক কুইজ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



চীনের হুনান প্রদেশের চাংশা থেকে আবু সাঈদ জানান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি চীনাদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে চাংশা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা শুরু করে হুনান উইকিমিডিয়া। যার মাধ্যমে বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সহ এরকম জাতীয় দিবস সমূহে আমরা চীনাদের সাথে অনলাইন এবং অফলাইন কার্যক্রমের মাধ্যমে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় শুরু করি। কিন্তু করোনা মহামারীর পর থেকে আমাদের সকল অফলাইন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে বাংলাদেশ এবং চীন সম্পর্কিত নিবন্ধ নিয়ে উভয় সম্প্রদায় কাজ করে যাচ্ছে।

এবারের বিজয় দিবসে জাতি করোনার এক সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করেছে। এই ত্রাস্তিকালে দেশবাসীর জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং হৃদয় উইকিমিডিয়ানদের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

চীন ভূখণ্ডের উইকিমিডিয়ান, ওয়াল্টার গ্রাসরন্ট সকল বাংলাদেশীদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক ইমেইল বার্তায় তিনি জানান, “বিজয় দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে কতটা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা এরকম একটি চমৎকার সুযোগ অর্জন করেছি। যেখানে স্বাধীনতার জন্য আমাদের অশ্রুঝরা রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে লড়তে হয়েছে। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের পঞ্চাশতম বিজয় দিবস, যে দিনটিতে বাংলাদেশিরা তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়। চীন ভূখণ্ডের উইকিমিডিয়া ব্যবহারকারী গ্রুপ (WMC), বলে চীনা সম্প্রদায়ের হয়ে বীর, সাহসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহান এই বাংলাদেশীদের সাথে আমরাও উল্লাস করতে উৎসুক! সকল বাংলাদেশীদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা!”



চীনের চচিয়াং প্রদেশের ছোটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোঃ আহসান শামিম জানান, চীনের চচিয়াং প্রদেশের ছোটো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছরের ন্যায় এইবারও পালন করলো মহান বিজয় দিবস। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে অসংখ্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চীনের বাইরে থাকা সত্ত্বেও, ক্যাম্পাসে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টায় সফল হয় অনুষ্ঠানটি। এইচ. এম. জাকির হোসেন (মাস্টার্স প্রথম বর্ষ), রায়হান (মাস্টার্স ২য় বর্ষ) এবং নিশাত (ব্যাচেলর শেষ বর্ষ) অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায়নে ছিলেন। অনুষ্ঠানে শুরুতে সম্মিলিতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। এরপরে সবাই মিলে কেক কেটে উদযাপন করেন। সবশেষে প্রীতি ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ইউনান টেকনোলজি অ্যান্ড বিজনেস ইউনিভার্সিটিতে বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। করোনা মহামারির কারণে অসংখ্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চীনের বাইরে থাকা সত্ত্বেও, ক্যাম্পাসে অবস্থানরত কিছুসংখ্যক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টায় ছোট পরিসরে সফল হয় অনুষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠানে শুরুতে সম্মিলিতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। এরপরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকলে একত্রিত হয়ে কেক কেটে উদযাপন করা হয়।



অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের
চীনা শিক্ষার্থীরাও অংশ নেয়

ইফতে খাইরুল হক ইমন
হনান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি



শীতল চাচা, আমাকে ক্ষমা কর

ঠিক বয়স মনে নেই। তবে থ্রি বা ফোরে পড়ি। মাথার চুল বড় হয়ে গেছে। মা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাথা ন্যাড়া করে দিবে। কিন্তু আমি কোনভাবেই রাজি নই। কিছুদিন আগে এক সহপাঠী মাথা ন্যাড়া করেছিল, সবাই তাকে টাকবেল বলে ডাকত, সহপাঠীরা হাসা হাসি করত। স্যারও একদিন ক্লাসের মধ্যে মুচকি হেসে ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আর যাই হোক মাথা ন্যাড়া করা যাবেনা। কিন্তু এসব কোন যুক্তিই মানতে নারাজ আমার মা। ন্যাড়া আমাকে হতেই হবে। যদিও শেষ পর্যন্ত আমার কাছে পরাজিত হলেন তিনি, সিদ্ধান্ত হল ন্যাড়া করা যাবেনা।

এরই মধ্যে আমার নির্দেশে বাড়ীতে এলেন শীতল কর্মকার। বাড়ীতে এসে তিনি আমাদের চুল কেটে দেন। আমরা শীতল কাকা বলে ডাকি। খুবই আদর করেন আমাদের। গল্প শোনান আর চুল কাটেন। শান্ত প্রকৃতির শীতল চাচাকে আমরাও খুব পছন্দ করি। কিন্তু একটা রাগ আছে তার উপর। বেচারী খুবই ব্যাকডেটেড, সব সময় ঝোড়া চুল কাটেন, একেবারে আর্মি ছাট। সেই জন্যই তিনি আমাদের পরিবারের মুরব্বীদের খুবই পছন্দের।

চুল কাটতে এসে তিনি বিষয়টি শুনে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা শুরু করলেন। নিষ্পত্তি হওয়া বিষয় নিয়ে পুনরায় আলোচনা শুরু হল। একপর্যায়ে চুল কাটার সময় ব্যবহারের জন্য তিনি যে ছোট পিতলের বাটিতে পানি রাখেন, আমি ন্যাড়া হতে রাজি হলে সেটি আমাকে দেওয়ার অফার করলেন। সেটি আমার কী কাজে লাগবে সে বিষয়টি বোঝার কোন জ্ঞান আমার হয়তো ছিলনা, তবে বাটিটা পাওয়ার লোভে আমি ন্যাড়া হতে রাজি হলাম। অতঃপর তিনি হাত থেকে কাঁচি ব্যাগে রেখে ক্ষুর বের করে ছোট একটি পাটায় সেটি ঘষতে শুরু করলেন, যেন ধার হয় এবং সহজেই আমার চুলে ভরা মাথা বেলের ন্যায় চকচকে হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমি যেন ব্যাথা না পাই। মুহূর্তেই আমার মাথাটি তিনি ন্যাড়া করে দিলেন।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি, সকালে উঠে মজ্জবে যাই। হুজুর সুরে সুরে অনেক মজা করে পড়ান। তিনি আমাদের ধর্মীয় অনেক বিষয়ই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন যে ব্যক্তি কথা দিয়ে কথা রাখেনা তাকে মুনাফিক বলে। যার অবস্থান হবে জানান্নাম।

আবার আগের কথায় আসি। শীতল চাচা সুন্দর করে আমার মাথা ন্যাড়া করে দিয়ে মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিলেন, যেভাবে স্যার আমার সহপাঠীর মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন। আর কথা বলতে বলতে তিনি বাটি থেকে পানি ফেলে তার ব্যাগে পুরতে লাগলেন।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, “এটা না আপনি আমাকে দিবেন!”

“তিনি হেসে দিয়ে বললেন,” এটা দিয়ে তুই কি করবি?”

আপনি আমাকে দিবেন না?

আরে বোকা, এটাতো আমার কাজের জিনিস। (বাটিটি ব্যাগে ঢুকাতে ঢুকাতে) তুই কী করবি এ দিয়ে?

ডান হাত দিয়ে সজোরে চড় বসিয়ে দিলাম শীতল চাচার বাম গালে। মুখে শুধু একটি শব্দ ‘মুনাফিক’!

স্তব্ধ হয়ে গেলেন শীতল চাচা। আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন। পাশেই দাঁড়ানো ছিল আমার গর্ভধারীণী। তিনি যেন বেহুশ। কী করল তাঁর একমাত্র আদরের ধন! কী বলে কী করে তিনি এর সংশোধন করবেন! এতটুকু ছেলে বয়স্ক একজন মানুষের গায়ে হাত দিলো, এটা তাঁর আত্মহত্যার শামিল। লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন। আমিতো ভোঁ-দৌড়। কিন্তু কসম করে বসলেন আমার মা, আমাকে না মেরে ভাত খাবেন না। আমি নিশ্চিত হলাম আমাকে আমার জননী ধোলাই দিবেই, সেই রকম ধোলাই! মায়ের হাতের ধোলাই খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম, কিন্তু পরিমাণ কীভাবে কমানো যায় এবার সে চেষ্টা। বাড়ি বাইরে সারাদিন কাটিয়ে আমার প্রশ্নে রাতে বাড়ি ফিরলাম। মা সব বর্ণনা দিলেন আমার কাছে। দেখলাম মামা চুপ করে আছেন। চোখ বড় বড়, এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। ভাবলাম দুই ভাই বোন হয়তো এখন একসাথে ধোলাবে। নানীও প্রস্তুত হচ্ছেন এই অত্যাচারীদের হাত থেকে তাঁর আদরের নাতিকে উদ্ধার করতে। হঠাৎ মামা আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। বললেন যা করেছো ভাল করেছো, সারা জীবন এভাবেই অন্যায়কে প্রতিহত করবে, মুনাফিকরা যেন তোমাকে ভয় পায়, কিন্তু বিড়বিড় করে বললেন তবে কখনো মুরব্বীদের গায়ে হাত দিতে নেই, তাই এভাবে তোমার কাজটি সঠিক হয়নি। তুমি শীতলের কাছে ক্ষমা চাইবে।

..... অনেক দিন পার হয়েছে। তারপর অনেক অন্যায়ের সামনেই আমি হয়েছি আতঙ্ক। কর্মক্ষেত্রে আড়াইশ’ এর অধিক কর্মকর্তার মিটিংএ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যখন ইনিয়িং বিনিয়িং অন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় রত, অনেকেই মন খারাপ করলেও মুখ খুলছেন না, আর দৌড়বাজ গোত্র তেলসমাতি করছেন। তখন সবথেকে জুনিয়র পদের কর্মকর্তা হয়েও বিনা ডাকে উঠে দাড়িয়েছি। দৃঢ় ভাষায় প্রতিবাদ করেছি। প্রতিহত করেছি। আপোষ করিনি কোন অন্যায়কে। কিন্তু আজ! চোখের সামনে কত কিছু দেখেও না দেখার ভান করছি। আমার কর্মক্ষেত্রে, আমার অজান্তেই দুর্নীতি করে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কেউ কেউ, যেখানে তত্ত্বাবধানে আমার নাম লেখা হয়েছে। কর্ম পরিষদ মিটিঙে টাকা কেন নিয়েছেন জানতে চেয়েছি, ফেরত দিতে অনুরোধ করেছি। কিন্তু কোন ফল পাইনি। শেষমেশ চুপ হয়ে গিয়েছি। মেনে নিয়েছি।

মামা, আমি বোধহয় আপনার কথা আর রাখতে পারছি না। পারছি না অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। আমি বোধ হয় হারতে শুরু করেছি। কোন অপরাধের প্রতিবাদ আর করতে পারছি না। চুপ হয়ে যাচ্ছি। প্রকারান্তরে অন্যায় মেনে নিয়েছি, আপোষ করছি।

শীতল চাচা, তাহলে তোমার এই সামান্য অন্যায় আমায় এমন আচরণ কেন করলাম! আমাকে ক্ষমা কর শীতল চাচা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

মুহম্মদ মফিজুর রহমান

পিএইচডি গবেষক

হুয়াং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

উহান, হুপেই, চীন



কনফুশিয়াসের চারটি শিক্ষামূলক গল্প

কনফুশিয়াস সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশি জানি, আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে পূর্ব চীনের সাংতুং প্রদেশে এই মহান দার্শনিক ও শিক্ষাবর্তী পতি জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ চীনা নাগরিকের চিন্তাধারা ও আচার-আচরণ থেকে শুরু করে, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কনফুশিয়াসের চিন্তা ও দর্শনের বেশ প্রভাব রয়েছে, বিশেষ করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কনফুশিয়াসের চিন্তাধারাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয়া হয়। কনফুশিয়াসের চিন্তা ও দর্শন শুধু চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার প্রভাব ছাড়িয়েছে পুরো পৃথিবীর জুড়ে, কনফুশিয়াসের চিন্তাধারা কনফুশিয়াস তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত। এছাড়া চীনের পার্শ্ববর্তী জাপান, কোরিয়া, ও ভিয়েতনাম সহ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের অনেক দেশে কনফুশিয়ান তত্ত্বকে একধরনের দর্শন কিংবা কনফুশিয় শিক্ষা হিসাবে মনে করা হয়। অনেকে কনফুশিয়াসের দর্শনকে ধর্মীয় চিন্তাধারা হিসাবে মনে করেন, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতির একজন ছাত্র হিসাবে আমি মনে করি কনফুশিয়ান তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন চীনের মতবাদগুলোর অন্যতম, যা আজ অবধি মানুষের কাছে লাগে, এই তত্ত্ব ধর্ম নয়, যা সাধারণ চীনা মানুষের কাছে এক ধরনের দর্শন মাত্র। মানুষের জীবনের প্রায় সবকিছু সম্পর্কেই কনফুশিয়াস অসাধারণ দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। এই প্রবন্ধে মূলত কনফুশিয়াসের চারটি শিক্ষামূলক গল্প বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করা হয়েছে, প্রথম গল্পটি কনফুশিয়াস ও মাঝি, দ্বিতীয় গল্পটি কনফুশিয়াস ও তাঁর শিষ্য জী জও এর গল্প অনুসারে, তৃতীয় গল্পটি মূলত কনফুশিয়াসের বাদ্যযন্ত্র (কু ছিন) বাজানো শিখার গল্প, এবং চতুর্থ গল্পটি কনফুশিয়াস তাঁর ছাত্র জী লুও এর গল্প বাংলায় অনূদিত করা হয়েছে।

গল্প ১ : কনফুশিয়াস ও মাঝি

একদা কনফুশিয়াস তার কয়েক জন ছাত্রকে নিয়ে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। ভ্রমণ করতে করতে যখন সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছালেন, কনফুশিয়াস অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ছিলেন, তাই তিনি তার একজন ছাত্রকে ডেকে বললেন পার্শ্ববর্তী সমুদ্র থেকে একটু খাবার জল নিয়ে আসতে। সমুদ্রতীরে ঠিক ততক্ষণই এক যুবক মাঝি পাশ থেকে কনফুশিয়াস ও তাঁর শিষ্যদের কথোকপন শুনে অট্ট-হাঁসি হেসে বললেন ‘সমুদ্রের জল এতো নোনা, এতো তিক্ত আপনি কি করে এই জল পান করবেন? কনফুশিয়াস তৎক্ষণাৎ মাঝি কে প্রতি উত্তরে বললেন ‘ওহ আচ্ছা, আমি আসলে নিজেকে অনেক বুদ্ধিমান মনে করতাম, প্রকৃতঅর্থে আমি এই প্রথম সমুদ্র দেখেছি, তাই সমুদ্রের জল নোনতা হয় এটা আমার জানা ছিল না। আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে এটা বলার জন্য। কনফুশিয়াস মাঝির কাছে এই নির্ভীকভাবে নিজের ভুল স্বীকার করা দেখে ছাত্রদের কাছে তাঁর সম্মান আরও বেশি বেড়ে গেল।

কনফুশিয়াসের উপদেশ: ভুল করায় লজ্জিত হয়ে তাকে অপরাধে রূপান্তরিত কর না। তোমার যদি কোনো ত্রুটি বা ভুল থাকে, তা স্বীকার করতে ভয় বা লজ্জা পেয়ো না বরং তা যথাসময়ে ত্যাগ করতে শিখো। নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়ার মাঝে লজ্জা নেই, নির্ভীকভাবে নিজের ভুল বুঝতে পারা এবং সংশোধন করে নেওয়াই প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ। প্রকৃতপক্ষে, কোন মানুষই সর্বগুণাধিত ও নিখুঁত নয়। কনফুশিয়াস সর্বদা আত্মদর্শনকে অনুপ্রাণিত করেন, তিনি মনে করেন প্রতিটা মানুষই নিজের ত্রুটি খুঁজে পাওয়া, স্বীকার করা এবং যথাকালে তা সংশোধন করাও অত্যন্ত জরুরী।

গল্প ২ : কনফুশিয়াস ও তাঁর শিষ্য জী জও এর গল্প

এটি প্রাচীনকালের চীনের লু রাজ্যের কথা, যে লু রাজ্য বর্তমানে সাংতুং প্রদেশ বলে পরিচিত। তখনকার সময়ে লু রাজ্যে এমন একটি আইন প্রচলিত ছিল যে, লু রাজ্যের কোন স্বদেশী যদি অন্য কোন রাজ্যে ক্রীতদাস হিসাবে নিদারুণ জীবন-যাপন করে এবং কোন ব্যক্তি যদি ওইসব ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আনে, লু রাজ্য তাকে সম অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ফেরত সহ পুরস্কৃত করবেন। একদা কনফুশিয়াসের শিষ্য জী জও লু রাজ্যের এক স্বদেশী ব্যক্তিকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি হতে দেখে তাকে নগদ অর্থের বিনিময়ে খালাস করে নিয়ে আসে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে স্বেচ্ছায় বিনিময় অর্থ ও পুরস্কার গ্রহণ করেন নি। লোকেরা তাঁর মহৎ কাজে বাহবাহ দিতে শুরু করল এবং তাকে এক মহান উদার মনের মানুষ হিসাবে আখ্যা দিতে লাগল। কনফুশিয়াস বিষয়টি জানতে পেরে অত্যন্ত মনঃক্ষুব্ধ হয়ে তিনি নিজের ছাত্রটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন ‘জী জও তুমি ভুল! যে কেউ এইভাবে সমস্যার দিকে নজর দিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিনিময় কোন অর্থ ও পুরস্কার গ্রহণ না করা হতে পারে এটা তোমার মহানুভবতা কিন্তু, তোমার এই পদক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে আরও দাসদের খালাস হতে বাধা সৃষ্টি করবে। ভবিষ্যতে, যখন কেউ লু রাজ্যের কাউকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি হতে দেখবে, তখন তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসার অভিপ্রায় থাকলেও অনেকেই তা এড়িয়ে যাবে কেননা লু রাজ্যে ফিরে যখন কেউ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিনিময় কোন অর্থ ও পুরস্কার গ্রহণ করতে যাবে তখন লোকেরা হয়ত বলবে জৈনক ব্যক্তির চরিত্রটি তার চেয়ে নিকৃষ্ট, জী জওের মত মহৎ নয়। এইভাবে হয়তো অনেকেই লু রাজ্যের কাউকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি কিংবা নির্যাতিত হতে দেখলেও না দেখার ভান করে এবং তাকে এড়িয়ে যাবে। সুতরাং, এই অনুশীলনটি ক্ষতিকারক যা আরও লু ক্রীতদাসদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার অন্তরায়।

গল্প ৩ : কনফুশিয়াসের বাদ্যযন্ত্র (কু ছিন) বাজানো শিখার গল্প

ছোট বেলায় একদা কনফুশিয়াস তাঁর শিক্ষকের কাছে বাদ্যযন্ত্র (কু ছিন) বাজানো শেখার উদ্দেশ্যে যান। কনফুশিয়াস অনেক দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনুশীলন করলেন। তাঁর শিক্ষক শিয়াংজি বলেন: ‘ঠিক আছে ভালো বাদ্য বাঁজাতে শিখে গেছো তুমি’। কনফুশিয়াস বলেছিলেন: এই টিউনটি/সুর কীভাবে বাজানো যায় আমি তাতে দক্ষতা অর্জন করেছি, তবে আমি সেগুলি এখনো গণনা করি নাই।

তাই কনফুশিয়াস আরও অনেক দিন অনুশীলন করার পরে, শিক্ষক শিয়াংজি এবারো বললেন: “এটা ঠিক আছে, আপনি ইতিমধ্যে সংখ্যায় রয়েছেন এবং অনেক বেশি দক্ষ হয়ে উঠেছেন (কু ছিন) বাজানোয়”। তবে কনফুশিয়াস তখনও বলেছিলেন: এখনও ঠিক ভাবে হয় নি, এটি কোনও লক্ষ্য নয় কেননা আমি এখনো এটার মর্মার্থ ধরতে পারি নি।

কনফুশিয়াস এবার আরও যথেষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে অনুশীলন করলেন, শিক্ষক শিয়াংজি ভেবেছিলেন যে এই সময়টি আসলেই ঠিক আছে, তবে কনফুশিয়াস তখনও ভেবেছিলেন যে তিনি এই সংগীতের অংশটি ভালভাবে এখনও বাজাতে পারেননি। অতএব, কনফুশিয়াস অনুশীলন অব্যাহত করেছিলেন এবং যতক্ষণ না সংগীতের অর্থটি বুঝতে পেরেছিলেন, এবং প্রকৃত সুর ধরতে পেরেছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি থামলেন না, অধ্যবসায় চালিয়ে গেলেন। তাঁর দর্শনটি হল : ‘জীবনের প্রতিটি প্রত্যাশা অধ্যবসায় উপর নির্ভর করে;’ যে মেকানিক তার কাজকে নিখুঁত করবে তার প্রথমে বারবার তার সরঞ্জামগুলোকে শাণিত করা আবশ্যিক।’

গল্প ৪ : কনফুশিয়াস ও তাঁর ছাত্র জী লুও এর গল্প

একদা কনফুশিয়াসের এক ছাত্র জী লুও এক ব্যক্তিকে পানিতে পড়ে যেতে দেখতে পেল। ততক্ষণেও কোন কিছু না ভেবেই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে লোকটির প্রাণ বাঁচালো। লোকটির পরিবার তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি গাভী উপহার দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে। অন্যরা পর্দার আড়ালে কনফুশিয়াসের এই শিক্ষার্থীর কথা বলা বলি করছিল। কনফুশিয়াস এটি সম্পর্কে জানতে পেরে এবং শিক্ষার্থীর প্রশংসা করে বলেছিলেন যে এই ছাত্রটি সঠিক কাজ করছে। এটি করার মাধ্যমে এখন থেকে লু রাজ্যে আর কেউ পানিতে পড়ে মরবে না, জলে পড়া মানুষকে আরও বেশি লোকে উদ্ধার করবে। কারণ মানুষকে বাঁচানোর পরে, তারা খুশি হয়ে যে উপহার দেয় তা গ্রহণ করা যায়।

কনফুশিয়াসের ব্যাখ্যাটি হল: যদিও অন্য মানুষের জীবন বাঁচানোর পরে উপহার গ্রহণ করা “নৈতিকতা” এর বিপরীত, তবে এটি আরও বেশি লোককে অনুরূপ নৈতিক আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং সংকটগ্রস্থ লোকদের আরও বেশি করে সাহায্য করতে মানুষ হাত বাড়িয়ে দিবে।

আগা মোস্তাফিজুর রাহমান চৌধুরী
মাস্টার্স শিক্ষার্থী, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা বিভাগ
সিচুয়ান ইউনিভার্সিটি, ছাংতু, চীন



মিনচিয়াং..

চীনের এক অজানা জনপদ

একটা সময় ছিল যখন চীন আমাদের কাছে ছিল এক রহস্যময় দেশ, যা কিনা দীর্ঘ ৪০০০ মতান্তরে ৫০০০ বছর পূর্ব থেকে এক সমৃদ্ধ জনপদ ও সম্রাজ্য নিয়ে গঠিত। আজকের এই আধুনিক সভ্যতার যুগে এসেও চীনের অনেক কিছুই আমাদের অজানা। চীনের উত্তরাঞ্চল হচ্ছে তেমন একটি অঞ্চল। তাই আজ আমি পরিচিত করাবো আপনাদের চীনের উত্তরের একটি বৈচিত্র্যময় এবং অসাধারণ অঞ্চল মিনচিয়াং প্রদেশ।

বরাবরই এই অঞ্চল নিয়ে আমার আগ্রহের কোন শেষ ছিল না। এটিকে মধ্য এশিয়াও বলা হয় এবং সেই আদি সিল্করোড এখানেই ছিল যা দ্বারা চীন যুক্ত ছিল আজকের এশিয়া ও ইউরোপের সাথে। এর নাম জিনজিয়াং (Xinjiang) মূলত চীনা নাম 西域 Xiyu থেকে এসেছে বাংলা করলে যার অর্থ হয় “পশ্চিমা অঞ্চল”, মূলত ইউরোপিয়ানদের আসা-যাওয়া এবং এখনকার অধিবাসীদের ভিন্ন আকার এ জন্য এটি হান চীনাদের থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

মিনচিয়াংকে ক্ষুদ্র কিছু বিষয় দিয়ে আলোকপাত করা খুব কঠিন কাজ, কেননা এর ব্যাপ্তি আরো বিশাল। শুধু এর আকার নিয়ে যদি বলতে হয় তবে বলা যায় এটির আয়তন ১.৬৬ মিলিয়ন কিমিঃ। অর্থাৎ, এটি আয়তনে প্রায় ফ্রান্সের তিনগুন, ভায়া যায়! এর সুদীর্ঘ ৫,৬০০ কিমিঃ সীমানা রয়েছে আটটি দেশের সাথে যেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে, মোঙ্গলিয়া, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কির্গিস্তান, তাজাকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারত।

মজার বিষয় হচ্ছে এটি চীনের মাত্র ছয় ভাগের একভাগ রিপ্রেজেন্ট করে কিন্তু এর অবস্থান একে করে তুলেছে অসামান্য। আদি সিল্করোডকে পুনরায় জীবন দেয়া হচ্ছে সেটা এর অন্যতম মূল কারণ। চীনের মহামান্য প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং স্বয়ং নতুন শিল্করোডের নবযাত্রার পথ তৈরী করেছেন। এই প্রকল্প কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অন্য দেশগুলোর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসাই অনেকটা আঁচ করে দেয়। শিল্করোড সকল দেশের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করছে। চীন সরকার আন্তরিকভাবে এর বাস্তবায়ন করছে যার মাধ্যমে অসংখ্য দেশ এর সাথে সম্পৃক্ত ও সুবিধাভুক্ত হবে। চীনের “বেল্ট এন্ড রোড” এর মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশও এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে যা কিনা আমাদের জন্য এক অসাধারণ সুযোগ বয়ে এনেছে।

মিনচিয়াং এর ব্যাপ্যারে যতটা না আমার আগ্রহ ছিল তা আরও বাড়িয়েছে আমার উইঘুরের বন্ধুরা। একি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুবাদে আমাদের সম্পর্ক আরো বেড়েছে। বলে রাখা ভাল মিনচিয়াং একটি উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। সাত মিলিয়ন উইঘুর ছাড়াও এখানে আরো বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে। রয়েছে কাজাখ, মঙ্গল, কির্গিজ, হুই, তাজিক, দাউর, তাতার, মানচু ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী। তাই বলাইবাহুল্য এই অঞ্চল নানা জাতিগোষ্ঠীর এক মিলনমেলা। আমার উইঘুর বন্ধুরাও আমাকে পরিচিত করিয়েছে তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, খাবার ও জীবনযাত্রার সাথে। এটি আমাকে এই অঞ্চলকে জানার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছে।

অতীতে মিনচিয়াংকে “Wild West” এর সাথে তুলনা দেয়া হত। যারাই একে পার করে এসেছে তারাই বর্ণনা করেছে ধূসর প্রাণহীন তপ্ত মরুভূমি আর ডাকাতির স্বর্গ বলে। স্বাভাবিক ভাবে এই বর্ণনার পরে কার সাহস আছে সেখানে যাবার। অথচ এটাই ছিল বণিকদের এক চাল যার কারণে বহুবছর তারা আড়াল করে রেখেছিল সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই অঞ্চলকে। অতীতের এই অঞ্চলের অসাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায় মার্কো পোলোর লেখায়। তিনি মিনচিয়াংকে গুপ্তাঞ্চল বলে অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

মূলত যারা বেইজিং থেকে এখানে আসবে তাদের প্রায় ৫ ঘণ্টা বিমানযাত্রা করতে হবে কিংবা বেইজিং থেকে বুলেট ট্রেনে প্রায় ৩০ থেকে ৩২ ঘণ্টা লাগবে। উরুমকি (Urumqi) হচ্ছে মিনচিয়াং এর রাজধানী। তিয়ান চি, টারপান, কাশগর, কুকা, ইয়েঙ্গিসার, কারঘিলিক, হুথান এগুলোও হচ্ছে মিনচিয়াং এর অন্যান্য শহরসমূহ। প্রতিটি শহরের কথা বলতে গেলে লিখে শেষ করা যাবে না তাই আর ব্যাখ্যা করলাম।



উইঘুরদের ভাষার ব্যাপ্যারটা যদি বলতে হয় তবে তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথম যখন আমি ওদের কথা শুনি ধরেই নিয়েছি এটি আরবী। আমার মাথায় এরচেয়ে কাছাকাছি আর কোন ধারণা আসেনি। তবে এই বিষয়ে ওদের কাছ থেকে এবং একটু তথ্য ঘাটাঘাটি করে জানতে পারলাম মূল বিষয়। মূলত এটি তুরস্কের আলটিক ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। উইঘুরদের রয়েছে অখণ্ডনীয় ইতিহাস এবং নানা ঐতিহাসিক লিপি যা চীনা ইতিহাসকে করেছে আরো সমৃদ্ধ। দশম শতাব্দীতে ইসলাম ও আরবী অক্ষরের সাথে পরিচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা হয় এখানে। না বললেই নয় চীনের সবচেয়ে বৃহৎ এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হচ্ছে মিনচিয়াং।

এতো কথা শুনে নিশ্চয়ই সবার খিদে পেয়েছে। তাহলে দেরী না করে চলে যাই মিনচিয়াং এর খাবারের রাজ্যে। মিনচিয়াং বিশ্বয়ে পরিপূর্ণ এলাকা। এদের খাবারের বৈচিত্র্য যে কত তা বলাই বাহুল্য। উইঘুরেরা তাদের প্রতিটি খাবার রান্না করে তাদের ঐতিহ্যকে সামনে রেখে। আস্ত রসুন এবং মরিচ তাদের সকল খাবারের প্রধান অনুষঙ্গ। খাবারের বর্ণনা উঠে এসেছে মার্কো পোলোর লেখায় লাগামান (ঘরে তৈরী একপ্রকার স্প্যাগেটি) যা আপনাকে ইউরোপের কথা মনে করাবে। আবার “পোলু” বা “পিলারফ” এর স্বাদ আপনাকে আরবীয় পিলারফ বা আমাদের বিরিয়ানীর কথা মনে করিয়ে দিবে। সুস্বাদু চাল, তেল, গাজর, খাসি মাংস, পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করা খাবারটি অস্বাধারণ। এখানে আরো রয়েছে বিশেষ ধরনের ফ্রাইড-ডাম্পলিং। ছোট ছোট করে কাটা মাংস আর সবজি দিয়ে রান্না করা মুখরচক “কুলদামা”। আরও আছে মিনচিয়াং কাবাব। প্রায় তুর্কি কাবাবের মতো হলেও স্বাদ ও রন্ধন প্রক্রিয়া একেবারে ভিন্ন। “দামান” এর মিট পাই কিংবা “কাটিক” এর মত সুস্বাদু দুই আপনার মুখে লেগে থাকবে। “নান” ই বাদ যায় কেন! উইঘুরের নান এর স্বাদ ও নক্সা সত্যিই বিচিত্র। পপি বীজ, সিসিমি বীজ ছড়িয়ে দেয়া হয় এর উপর। আমাদের দেশের মত উনুনের রান্না করা এই নান কখনো কখনো ডায়ামিটারে ৬০ সে.মিটারের উপর হয়।

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা



শুধু খাবার নয়, এখানকার মানুষরাও অনেক আলাদা। নানা সংস্কৃতির মেলবন্ধনে আবদ্ধ এই অঞ্চলে উইঘুরেরা তাদের বৈশিষ্ট্য সেই আদিকাল থেকে একইরকম বজায় রেখেছে। কাশগরের দিকে দেখলে আমরা পাই মুৎশিল্লের কারুকাজ। বংশপরম্পরায় তারা তাদের এই শিল্পকে চালু রেখেছে। উডুমকি বা ইয়েঙ্গিসার পাই সংগীত আর সুরের মূর্ছনা। উৎসব-পার্বণে নারী-পুরুষ সবাই ঐতিহ্যবাহী নাচ পরিবেশন করে। ছেলে-বুড়োতে কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই একসাথে উপভোগ করে আর করবে নাই বা কেন! চীন বরাবরই পরিবারকেন্দ্রিক। সিনচিয়াং তার ব্যতিক্রম নয়। তাই সবাই একসাথে বসবাস ও জীবিকা নির্বাহকরে। আধুনিক জীবনের ছোঁয়ায় এখানেও একক পরিবার বেড়েছে কিন্তু এখনো তাদের মধ্যে রয়েছে অটুট পারিবারিক বন্ধন। সিনচিয়াং এ যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন কোথায় ঘোরা যাবে তবে আমি বলবো, আপনি সব দেখে শেষ করতে পারবেন না, বাকী চীন ঘুরে দেখা সে তো পরের বিষয়। শুরুতেই কথা বলি উডুমকি শহর নিয়ে। উডুমকি (Urumqi) হচ্ছে সিনচিয়াং এর রাজধানী যা এক কথায় অসাধারণ। উত্তর চীনের জীবন যদি উপভোগ করতে চান তবে সিনচিয়াং রাজধানী আপনার প্রথম ঠিকানা। মরুভূমিতে গড়ে উঠা এক শহর যার পরতে পরতে রয়েছে বৈচিত্র্য। ২ মিলিয়ন লোকের আবাস এই শহরটিতে আধুনিক সুউচ্চভবন যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে কারুকাজ করা মসজিদ ও প্রাচীন রাস্তাঘাট। এ এক আধুনিকতা ও অতীতের যুগবন্ধন।

উত্তর সিনচিয়াং যদি না দেখেন তবে আপনি কিছুই দেখেননি। জীবন এখনে বিচিত্র নানা রংয়ে সাজানো। উল্লেখ্য স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে “বুরজিন” (Burqin) যা কিনা রাজধানী উডুমকি থেকে ৬২০ কিমিঃ দূরে অবস্থিত। উত্তরপর্বতসমূহ এবং বনে ঘেরা এ পরিবেশ আপনার ভাল লাগবে। কিছুটা সময় নিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারেন “আরকিস” শহর থেকে। এখানেই রয়েছে চীনের একমাত্র নদী যা কিনা আর্কটিক মহাসাগরের সাথে যুক্ত। অবশ্যই ভুলবেন না রাতের বাজার যাওয়া এবং গিল করা মাছ সাথে দই ও স্থানীয় পানীয় কাথং পান করা।

চীনের অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ পথ কারঘিলিক এর কথা আমরা ভুলে যেতে পারি না। এটি চীনের অন্যতম আরেকটি প্রদেশ টিবেট এর সাথে সিনচিয়াংকে সংযুক্ত করেছে। এই শহরটি অতি প্রাচীন এবং অসামান্য কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শনে ভরপুর।

এখানে আছে ১৫০০ শতাব্দির প্রাচীন জামে মসজিদ। সরু রাস্তা কারুকাজ করা শহরের অভ্যন্তরীণ দেয়াল আপনাকে নিয়ে যাবে মধ্যযুগে।

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর আগে পত্তন হওয়া চীনের প্রাচীন শহর হচ্ছে হুতান (Hotan)। চীনের অন্যতম সম্পদ জেড পাথরের উৎপত্তি বেচাকেনার অন্যতম প্রাচীন সিনচিয়াংয়ের এই শহরে খুঁজে পাবেন নানান ইতিহাস। অতীতের সিল্করোডের চলাচল ও নানা যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছে এই শহরটি। এখানেই ঐতিহাসিক শিল্প তৈরীর করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার হয় এবং চীনা সম্রাজ্য হাজার বছর ধরে যার রহস্য সারা পৃথিবীর কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিল। বর্তমানে এটি চীনের অন্যতম বর্ধনশীল শহর যা নতুন ব্যবসা এবং ইকোনমিক জোন সৃষ্টিতে সাহায্য করছে।

সিনচিয়াংয়ের ইয়েঙ্গিসার শহর বিখ্যাত ছুরি নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ। এটি উইঘুরদের ঐতিহ্য ও জীবনের সাথে জরিত। তাদের এই অঞ্চলের বিশ্বাস অনুযায়ী তারা শিশুর বালিশের নিচে ছুরি রাখে যেন বড় হয়ে শক্তিশালী এবং সাহসী হয়। এটি কাশগর এর পূর্ব তুর্কিস্থানের রিপাবলিকান নেতা ইউসুফ আলপেতিকিন (১৯০১-১৯৯৫) জন্মস্থান।

সিনচিয়াংয়ের অন্যতম পথ “কারাকোরাম পথ” (Karakoram Road KKH) এর কথা না বললেই বড় অবিচার হয়ে যায়। এর অন্যতম উচ্চস্থান হচ্ছে কুনজারাব পাস (৪৮০০ মিটার)। পিলে চমকে দেয়া এই পথ আপনাকে যেমন আনন্দ দেবে তেমনি এর ইতিহাস করবে রোমাঞ্চিত। প্রাচীন কালে সিল্করোডের সাথে সম্পৃক্ত এই পথ ছিল ডাকাত-লুটেরাদের অভয়ারণ্য। রক্তে ভেজা এই পথ আজও চীনের অন্যতম ব্যবসায়িক আন্তর্জাতিক মাল পরিবহনের রুট।

এছাড়াও রয়েছে টারপান শহর যেখানে আছে ঐতিহাসিক আর্কিওলজিক্যাল সাইট “এমিন মিনারেট”। শহর ছাড়িয়ে ৫০ কিমিঃ দূরে রয়েছে গোবি মরুভূমি ও তার নিদর্শন “রুইনস অফ গাওছাং”। এছাড়াও রয়েছে “ভ্যালি অফ তুউগও” যা ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যময় এলাকা।

আগেই বলেছিলাম বলা শুরু করলে আর শেষ করা যাবে না। আরও অনেক কিছুই বাকি রয়ে গিয়েছে যা এক কলামে লেখা সম্ভব নয়। চীনের সরকারের অন্যতম মেগা প্রজেক্টের কারণে চলমান সময়ে সিনচিয়াংয়ের ভূমিকা ও গুরুত্ব আগের চেয়ে বেড়েছে। একই সাথে বহির্বিশ্বে এর প্রয়োজনীয়তা এবং নানা পক্ষ-বিপক্ষ আলোচনা সমালোচনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু চীনা সরকারের কঠোর ও সঠিক দিক নির্দেশনায় এই অঞ্চল ক্রমে আরো শক্তিশালী হচ্ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা নানান রঙ ও বৈচিত্র্যের চারণভূমিতে আসার জন্য সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ।

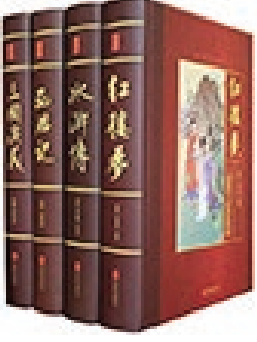
মোঃ হানিফ আল সাক্বির

স্টুডেন্ট অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এন্ড ক্লাউডিং
উশী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, চিয়াংসু, চীন



四大名著

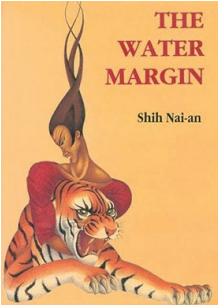
চায়নার সেরা চারটি উপন্যাস



চীনা দর্শন বা চাইনিজ দার্শনিক নিয়ে আমরা কমবেশি সবাই জানি। কনফুশিয়াস, লাওজি সহ চীনের মহাপ্রাচীর, হান সাম্রাজ্য বা জনপ্রিয় চিং মিং সাম্রাজ্যের সময়কার “Along the River” চিত্রকর্ম সবারই অনেক জানাশোনা আছে। চীনা সাহিত্য নিয়ে কথা বললে চীনের চারটি সেরা উপন্যাস নিয়ে না বললেই নয়। চাইনিজ ভাষায় এই চারটিকে একসাথে বলে 四大名著 (si da ming zhu)। দীর্ঘ চারটি কাল্পনিক উপন্যাস সাধারণত চীনা সাহিত্যের সেরা উপন্যাস হিসাবে বিবেচিত। চারটির মধ্যেই কিছু মিল পাওয়া তার মধ্যে বিশেষত এগুলি প্রাচীন কালজয়ী ইতিহাস ও সে সময়ের কথ্য ভাষায় লেখা হয়েছিল।

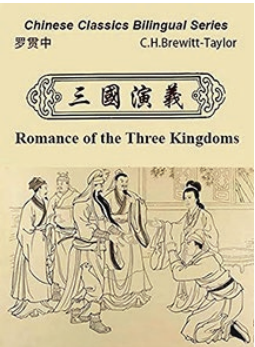
এছাড়াও, চারজন লেখকই অনেক গুণী ও বিখ্যাত। চারটি উপন্যাসই পূর্ববর্তী যুগে চীনা সাম্রাজ্যের উন্নয়নের জন্য চূড়ান্ত রূপ ছিল। এগুলি সাহিত্যিক ও প্রশাসনিক শাসকগণ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং মানব সমাজ, পারিবারিক জীবন এবং রাজনীতি সম্পর্কে দার্শনিক ধারণা, ইতিহাস এবং ধারণাগুলি ধারণ করে এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির অংশকে সংজ্ঞায়িত করে। এর মধ্যে দুটি 水 (Shuǐhǔ zhuàn) ইংরেজিতে Water Margin এবং 三国演义 (Sānguó yǎnyì) ইংরেজিতে The Romance of Three Kingdom আধা-ঐতিহাসিক এবং দীর্ঘ উপন্যাস। সেগুলি আবার অনেকে প্রখ্যাত কবি ও দার্শনিক টলস্টয়ের রচনা যেমন War and Peace এর মতো বলে মনে করেন।

楼梦 (Hong lou meng) ইংরেজিতে Dream of the Red Chamber উপন্যাসটি অত্যন্ত সম্মানিত ও সমাদৃত হয়েছিল যখন এটি চীন এবং জাপানের মধ্যকার যুদ্ধের সময় প্রকাশিত হয়েছিল এবং 西游 (Xi you ji) ইংরেজিতে Journey to the West আমাদের রামায়ণ বা ওডিসি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো একটি পৌরাণিক কাহিনী। পূর্ণ এই চারটি উপন্যাসকেই চীনের ফোর গ্রেটেস্ট ক্লাসিক উপন্যাস বলা হয়। এই লেখায় আমরা এই চারটি উপন্যাস নিয়ে জানার চেষ্টা করবো।



Water Margin: চায়নিজ ভাষায় এর নাম 水 (Shuǐhǔ zhuàn)। চায়নার চারটি ধ্রুপদী উপন্যাসের একটি হলো এটি। ১৪শ শতকে চায়নিজ বিখ্যাত লেখক শিনায় আন (施耐庵) সেসময়কার সং ডায়নেষ্টির ১০৮ জনের একটি বিপবী দল ও তাদের কাহিনী নিয়ে কালজয়ী এই উপন্যাস রচনা করেন। রাজার কাছ থেকে সাধারণ ক্ষমা পাওয়ার আগে কিভাবে বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা করেছে তারই গল্প এই উপন্যাসে।

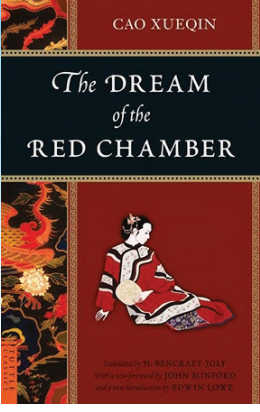
এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখন চায়নার বিখ্যাত সব চরিত্রদেরকে পাঠকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তাদের মধ্যে উ সং, লিন চং জিন সেন উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটি একশটি ভাগে বিভক্ত। ধারণা করা হয় তার প্রথম সত্তরটিই শি নায় আন লিখেছিলেন। আর পরবর্তীতে তারই ছাত্র লু গুয়ানবাং লিখেছেন। উপন্যাসটি প্রাচীন চায়নিজ ভাষায় লেখা। পরবর্তীতে এটি অনেক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই উপন্যাস চায়নিজ সংস্কৃতির একটি অংশই বলা যেতে পারে। এটির গল্পকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে অনেক সিনেমা নাটকসহ ভিডিও গেমসে তৈরি হয়েছে। সাগরের ধারের এই অকুতোভয় দলটির কথা এখনো সব চায়নিজদের মুখে মুখে।



The Romance of Three Kingdom : চায়নিজ ভাষায় এর নাম 三国演义 (Sānguó yǎnyì)। এটি ১৪ শতকে হান সাম্রাজ্যের শেষে এবং চীনা ইতিহাসের তিন রাজ্যের সময়কার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরেক চায়নিজ বিখ্যাত লেখক লু গুয়ানবাং (中) রচনা করেন। হান সাম্রাজ্যের পতনের সময় যে তিনজন কিংবদন্তী ভিন্ন ভিন্নভাবে তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার্থে শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন এবং তিনজনের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো সেটি নিয়েই এই উপন্যাস। এই তিনজন কিংবদন্তী হলেন Cao Wei, Shu Han এবং পশ্চিমের Wu।

উপন্যাসটি মোট একশ বিশ ভাগে বিভক্ত ও প্রায় আট লাখ শব্দ রয়েছে। যার মধ্যে এক হাজার পৌরাণিক শব্দ। মূলত ব্যক্তিগত ও সামরিক লড়াই, ষড়যন্ত্র এবং সংগ্রাম নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। ইংরেজ লেখক উইলিয়াম শের্রিপয়ার এই উপন্যাস দ্বারা অনেক

প্রভাবিত হয়েছিলেন যার তার রচনাগুলোতে প্রকাশ পায়। পূর্ব-এশিয়ার সবচেয়ে অনবদ্য রচনা হিসেবে এটি এখনো বিবেচিত হয়। এটিকে কেন্দ্র করে অনেক সিনেমা, নাটকসহ চায়নিজ অপেরার মঞ্চায়ন হয়েছে। হালের বিখ্যাত লেখক Hyung-eun Kim বলেছেন, "রোম্যান্স অফ দ্য থ্রি কিংডম পূর্ব এশিয়ার বাইবেলের মতো। এটি এই অঞ্চলের সর্বাধিক পঠিত ক্লাসিকগুলির মধ্যে একটি।"



Dream of the Red Chamber: চায়নিজ ভাষায় এর নাম 红楼梦 (Hong lou meng)। বিখ্যাত চীনা লেখক ও গবেষক 曹雪芹 (চাও শুয়ে চিন) রচিত এই উপন্যাসটি চায়নার সেরা চারটি উপন্যাসের একটি। এটি ১৮ শতকের মাঝামাঝি চিং ডাইন্যাসটির সময়ে রচিত হয়েছে। এই অনবদ্য উপন্যাসটি চীনা কথা সাহিত্যের অন্যতম সেরা রচনা বলে বিবেচিত হয়। এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই রেডোলজি গবেষণা হয়েছে। এই উপন্যাসটি আধা আত্মজীবনীমূলক বলে অনেকে ধারণা করেন। কেননা চিং ডাইন্যাসটির প্রভাবে লেখকের নিজের পরিবারের উত্থান-পতন কিভাবে হয়েছিলো তা নিয়েই এই উপন্যাস

উপন্যাসের প্রথম অংশেই লেখক তিনি তার আত্মীয়স্বজন, সকল যুবক-যুবতী ও চাকরসহ সাধারণ মানুষদের স্মরণ করেছেন। উপন্যাসটি শুধুমাত্র কেবল অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রের জন্যেই নয় আঠারোশ শতকের চীনা জীবনযাপন ও সামাজিক কাঠামো ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ চীনা প্রাচীন সাহিত্যশৈলীতে রচিত। উপন্যাসটি মোট একশ বিশভাগে বিভক্ত। চায়নিজ অপেরাসহ অনেক সিনেমা তৈরি হয়েছে এই উপন্যাসের গল্পকে কেন্দ্র করে। ড্রিম অফ দি রেড চেম্বার উপন্যাসটি বহু ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বহির্বিশ্বে এটি নিয়ে বহু গবেষণা অধ্যয়ন চলমান রয়েছে।



Journey to the West: ওডিসি বা উপমহাদেশের রামায়ণ এর মতো পৌরাণিক এই উপন্যাসের নাম 西游记 (Xi you ji)। উ চাং আন (吴承恩) রচিত এই উপন্যাসটি নিঃসন্দেহাতীতভাবে পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। ষোলশ শতকে মিং ডাইন্যাসটিকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি চায়নার সেরা উপন্যাসের একটি। অনেকে আবার এটি সেরাদের সেরা বলে দাবী করেন। বিখ্যাত মাংকি কিং এই উপন্যাসের একটি অন্যতম চরিত্র। বুদ্ধ ধর্মের পবিত্র মন্ত্র খুঁজে রণ করতে গৌতম বুদ্ধের নির্দেশে বুদ্ধ ভিক্ষু তাং সাং জান এর পশ্চিমাঞ্চল এর দিকের যাত্রা ও সে যাত্রার কাহিনি নিয়েই উপন্যাস রচিত হয়েছে। চীনা লোকধর্ম, চীনা পুরাণ, কনফুসীয় বাদী, তাওবাদী ও বৌদ্ধ দর্শনে শক্তিশালী এবং তাওবাদী অমর এবং বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বের ধারণক ও বর্তমান কিছু চীনা ধর্মীয় মনোভাবের প্রতিচ্ছবি এই উপন্যাস।

উপন্যাসটি একবারে একটি কমিক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী, চীনা আমলাতন্ত্রের একটি হাস্যকর ব্যঙ্গ, আধ্যাত্মিক অর্জদৃষ্টির একটি বর্ণনা, এবং একটি বর্ধিত রূপকথন যেখানে তীর্থযাত্রীদের দলটি সহযোগিতার শক্তি এবং গুণ দ্বারা আলোকিতকরণের দিকে যাত্রা করে। উপন্যাসটিতে সর্বমোট ১০০ টি চ্যাপ্টার রয়েছে যাকে আবার চারটি মূল ভাগ ভাগ করা হয়েছে। তাং সাং জান বা ত্রিপিটক, মাংকি কিং বা বাইজি, শা উ জিং উপন্যাসটির মূল চরিত্র। বিখ্যাত লেখক আর্থোর ওয়াইলি এটিকে মাংকি: এ ফোক টেইল অফ চায়না নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এছাড়া অনেকেই জার্নি টু দ্যা ওয়েস্ট নামে এটিকে অনুবাদ করেছেন। এটিকে কেন্দ্র করে চায়নিজ অপেরার শেষ নেই। অনেক সিনেমা



নির্মাণ হয়েছে এটির গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। এছাড়া বর্তমানে চায়নার অন্যতম ধারাবাহিক নাটকও এই গল্প দ্বারা নির্মিত। উপন্যাসটি চায়নিজদের আবেগের জায়গা দখল করে আছে।

অনেকেই এই চারটি মহান ধ্রুপদী উপন্যাস গুলো সাধারণত আধুনিক-পূর্ব চীনা কল্পকাহিনীর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী রচনা বলে বিবেচনা করে। যেসকল ডাইন্যাস্টিকগুলো চীনা সংস্কৃতিতে বেশি প্রভাব ফেলেছে সেগুলোকে কেন্দ্র করে রচিত হওয়ায় এই উপন্যাসগুলো পাঠকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। চীন ছাপিয়ে জাপান, ভিয়েতনাম সহ পূর্ব এশিয়া এবং পুরো বিশ্বে এই চারটি উপন্যাস সমাদৃত। অনেকে কনফুশিয়ানিজমের সাথে এই চারটি উপন্যাসের সাথে মিলিয়ে ফেলেন তবে এই রচনাগুলোতে কনফুশিয়াস ও তার দর্শনের কোনো চিহ্ন নেই। বরং চীনা সভ্যতা, আদি সংস্কৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক কাঠামোই ফুটে উঠেছে এসবের মধ্য দিয়ে। সর্বোপরি, ইউরোপের দান্তে বা শেক্সপিয়ারের মতো, এই চারটি উপন্যাস হল সেই স্পর্শকণা যেখানে চীনা সাহিত্য সংস্কৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে নতুন প্রাসঙ্গিকতা এবং তাজা অন্তর্দৃষ্টি আবিষ্কার করতে ফিরে আসে।

মঈন উদ্দিন হেলালী তৌহিদ
সাইথ ওয়েস্ট পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটি
ছাংতু, সিচুয়ান, চায়না



ইউয়েলু অ্যাকাডেমি

হাজার বছরের ঐতিহ্য সম্পন্ন এবং চীনের সর্বোচ্চ চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম একটি হলো Yuelu Academy। প্রতিষ্ঠানটি যেমন উচ্চশিক্ষার জন্য সুপরিচিত তেমনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান ধরে রাখার জন্যও বিখ্যাত। উত্তরের Song রাজপরিবারের 'Kai Bao' এর রাজত্বকাল ৯৭৬ এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। অ্যাকাডেমি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল চারটি রাজপরিবারের (Song, Yuan, Ming, Qing) শাসনামলেই এবং ১৯০৩ সালে এটি Hunan institute of Higher Learning হিসেবে নামকরণ করা হয় এরপর Hunan Normal College, Hunan Public Polytechnic এবং সর্বশেষ ১৯২৬ সালে Hunan University নামে পূর্ণতা লাভ করে।



হাজার বছরের ইতিহাসে সাক্ষী এই প্রতিষ্ঠানটি চলমান রয়েছে কোন রকম বাধা-বিঘ্নতা ছাড়াই, Yuelu Academy থেকে Hunan University পর্যন্ত এর ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলো চিন এর উচ্চশিক্ষা উন্নতির প্রতীক এবং চিন এর বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রতিফলন।

Yuelu Academy প্রতিষ্ঠার খুব কম সময়ের মধ্যে পুরো China তে সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিল এর অদ্বিতীয় পরিচালনা ব্যবস্থা এবং শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য। উত্তরের রাজপরিবারের রাজা Zhenzong যখন সাক্ষাৎকারের জন্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির প্রধান Zhou Shi কে নিমন্ত্রণ করেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে মহামান্য শিলালিপি প্রদান করেন 'Yuelu Academy' তখন ই তার মহান খ্যাতি অর্জন করে। এরপর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি Hunan এর 'Xiao Xiang Zhu Si' যার মানে হচ্ছে এমন একটি জায়গা যেখানে হাজারো পন্ডিতের মিলনমেলা, নামে পরিচিত হয়ে যায়। এখানেই 'লি' দর্শনের উপর ভিত্তি করে 'Huxiang School of Learning' শুরু হয় এবং এর দৌরাত্র বাড়তে থাকে যখন 'Zhang Shi' উত্তরের সং রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। 'Zhu Xi' দ্বিতীয়বারের মতো যখন বক্তৃতা দিতে আসেন ততদিনে তিনি সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার কাজের জন্য। পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছিল যে বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। এর ফলে 'Yimma Pond' যা শুধু ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্য ব্যবহার করা হতো, এটি থেকেও ঘোরা দিয়ে পানি নিষ্কাশন করা হয়েছে দর্শকদের বসার জায়গা দেওয়ার জন্য। পরবর্তিতে প্রতিষ্ঠানটি YangMing School হিসেবে Ming রাজবংশের সাথে মতবিনিময় করে। Donglin School B ছিল Ming রাজবংশের সর্বশেষ বর্ষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, Qing Long এবং Jia Qing এর শাসন- আমলের (১৭৩৬-১৮২১) Han School এবং Qing রাজপরিবারের শেষ বর্ষের 'New Learning'। Hunan এর শিক্ষাব্যবস্থা, ঐতিহ্য গঠন এবং উন্নয়নে Yuelu Academy এর প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মোঃ নূর শাহরিয়া
হুনান বিশ্ববিদ্যালয়



চৈন প্রদীপ

আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের কথা আমরা প্রায় সবাই জানি। প্রদীপ সে আশ্চর্যই হোক অথবা সাধারণই হোক, তা সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষের গৃহস্থালি জীবনের একটি অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে, যা যুগ যুগ ধরে মানুষের অন্ধকার দূর করে চলেছে। দিনের সূর্য অস্তচলে গেলে আগেকার দিনে অন্ধকার দূরীকরণের একমাত্র অবলম্বন ছিল প্রদীপ বা তেল বাতি। এই তেল বাতিকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে বিভিন্ন কবিতা, গল্প, উপকথা এবং কল্পকাহিনী। যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এই প্রদীপ বা তেল বাতি। একটা সময় ছিল যখন প্রতিটি বাড়িতে সন্ধ্যা প্রদীপ দেবার নিয়ম ছিল। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় এগুলোর স্থান হয়েছে জাদুঘরে। এখন বাতি বলতেই আমরা বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার বুঝি, যা আমাদের আলোর স্বল্পতা মেটাতে সক্ষম হলেও মানুষকে করে তুলেছে যান্ত্রিক এবং দূরত্ব তৈরি করেছে অতীত ঐতিহ্যের ধারক তেল বাতির সঙ্গে। তাই বর্তমান সময়ে তেল বাতি দেখতে হলে আমাদের যেতে হয় উপাসনালয়ে বা কোন জাদুঘরে।

পৃথিবীতে তেল বাতির ইতিহাসে চীনা তেল বাতির অবিচ্ছিন্ন এক অনন্য ঐতিহ্য রয়েছে। সভ্যতার কালক্রমে চীনা তেল বাতি তৈরিতে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে যার মধ্যে মাটি, ব্রোঞ্জ, চিনামাটি সহ বিভিন্ন সংমিশ্রিত উপাদান রয়েছে, যেগুলো খুব সহজেই প্রকৃতি থেকে আহরণ করা যায়। সময়ের প্রয়োজনে চীনা তেল বাতির আকার আকৃতি এবং নকশায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। তেল বাতির আকৃতিতে যুক্ত হয়েছে মানুষ, পশু বা পাখির আকৃতি। একসময় যে তেল বাতি শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহৃত হত, তাই কালক্রমে শিল্পের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। “হান” রাজবংশের ধোঁয়া নালী নকশা এবং ফর্মের নিখুঁত সংমিশ্রণ এবং “তাং” রাজবংশের একটি সহজ অথচ অতুলনীয় সাশ্রয়ী কারি যন্ত্র নিঃসন্দেহে বিশ্বমানের প্রযুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় চৈনিক শিল্পীরা তেল বাতি তৈরিতে শিল্প এবং প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

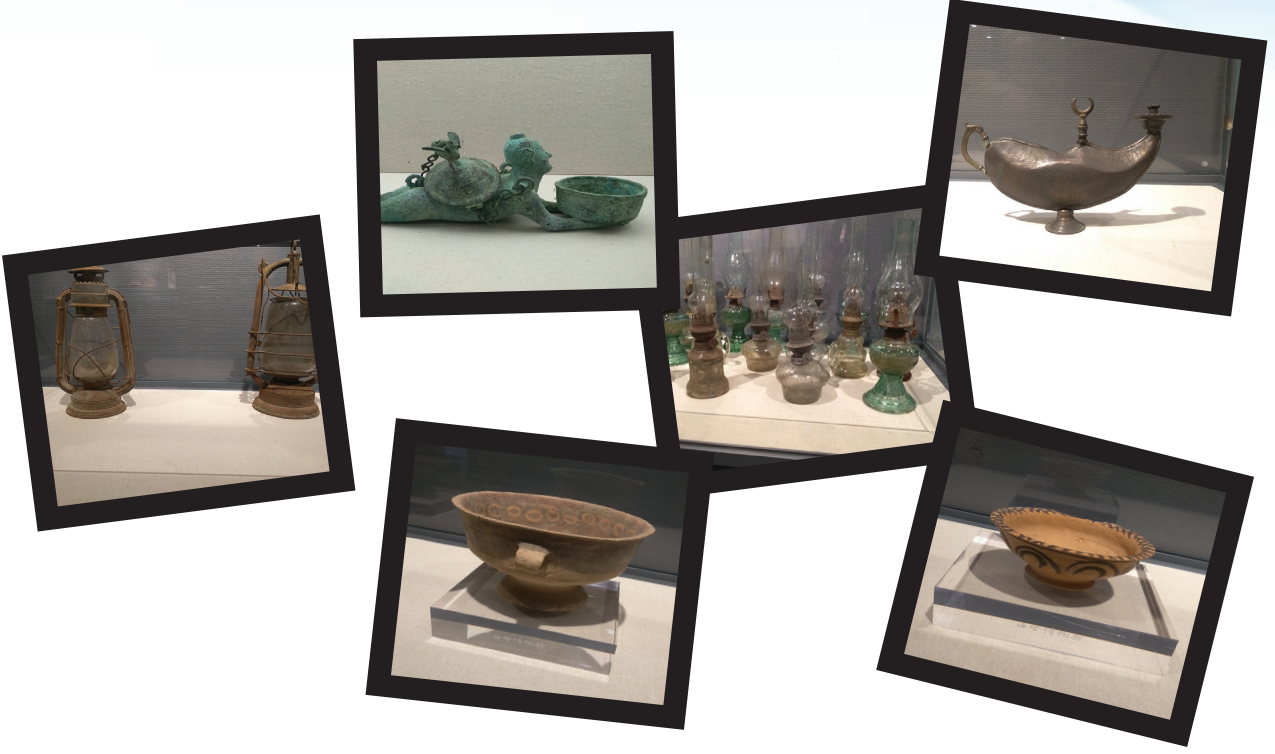


Museum of Oil Lamps

এই জাদুঘরটি চীনের চিয়াংসু প্রদেশের ছাং চৌতে অবস্থিত। চীনের বিখ্যাত শিল্পী “ছ্যান লু শ্যাং” এর প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরে রয়েছে হান রাজবংশের সময় থেকে চীনের বিভিন্ন রাজত্বকালের সময়ে তৈরি করা অসংখ্য তেল বাতি। যেগুলোর নকশা এবং আকৃতি সহজেই দর্শকের মন আকৃষ্ট করে।

জাদুঘরটিতে প্রবেশ করলে প্রথমেই আপনার নজরে আসবে “হান” রাজবংশের সময় কালে তৈরি করা কিছু মাটির তেল বাতি যা আকৃতিতে আমাদের দেশের মলিকা বা সরা এর ন্যায়। তেল বাতি গুলির সৌন্দর্য বর্ধনে এগুলোর উপরে বিভিন্ন রকমের জ্যামিতিক নকশা অঙ্কন করা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি বাতিকে একসাথে যুক্ত করে জটিল ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই মাটির প্রদীপ গুলি। অনেক সময় ব্যবহারের সুবিধার্থে তেল বাতি গুলিতে যুক্ত করা হয়েছে হাতল।

জাদুঘরটির মধ্যভাগের একটি অংশজুড়ে রয়েছে ব্রোঞ্জের তৈরি বিভিন্ন আকৃতির তেল বাতি। অসম্ভব সুন্দর এই তেল বাতিগুলিকে মানুষ বা পশু পাখির আকারে তৈরি করা হয়েছে। ধীরে ধীরে মানুষের কাছে ব্রোঞ্জের ব্যবহার সহজলভ্য হলে এই ব্রোঞ্জকেই বিভিন্ন আকার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে হরেক রকমের তেল বাতি। চীনা তেল বাতি তৈরিতে চীনা মাটির ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাপকহারে। চীনা মাটির তৈরি এই তেল বাতি গুলির আকৃতিতে সভা পেয়েছে মানুষ, ঘোড়া, সিংহ, মাছ, ফুল সহ বিভিন্ন নকশা।



জাদুঘরটির শেষ প্রান্তের একটি কক্ষে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবহার করা কিছু তেল বাতি। যেগুলো তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে কাঁচ বা ধাতব কিংবা মিশ্র পদ্ধতি। প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় এই তেল বাতি গুলির নকশা এবং ব্যবহার উপযোগিতায় যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। কালের বিবর্তনে এইসব তেল বাতির ব্যবহার হ্রাস পেলেও এক সময় যে এই তেলবাতি গুলিই মানুষের অন্ধকারের চলার সঙ্গি ছিল তা এক বাক্যে স্বীকার করতে হবে। প্রদীপ শুধু মাত্র অন্ধকারই দূর করতেই সাহায্য করেনি বরং সভ্যতা বিকাশে মানুষের জ্ঞানের আলোকে প্রস্ফুটিত করতে সাহায্য করেছিল। চীনা সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই চীনা তেল বাতি গুলি মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি।

সুব্রত কুমার ভৌমিক
নানচিং ইউনিভার্সিটি অব দ্যা আর্টস, চীন



চলতে পথে আসার দেখা চীনা প্রযুক্তি

“জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও” উক্তিটি কর্মবৈশি সবারই জানা। হ্যাঁ, আসলেই জ্ঞান অর্জনের জন্য জীবনে অন্তত একবার হলেও চীন দেশ ঘুরে যাওয়া প্রত্যেকের উচিত বলে মনে হয়। প্রযুক্তির ছোঁয়া নেই, এমন কোন জায়গা এখানে খুঁজে পাওয়া মুশকিল, চীনা প্রযুক্তির সামান্য কিছু নমুনা নিয়ে আজকের আয়োজন।



দেশ থেকে আসা বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যারদের সাথে

জায়গাও ভরা যায়। একজন স্যার আমার কানে এসে ফিসফিস করে বললেন ‘কমদামী কিছু কম্বল, সিট কাপড় আমার খুব দরকার ছিল’ এখানে পাওয়া যাবে কিনা। আমি স্যার কে বললাম ‘এখানে যেগুলোর যেমন দাম দেখলেন সবখানে ওই একই রকম হবে, দামের খুব সামান্য হেরফের হতে পারে’। স্যারেরা বললেন ‘এর থেকে আমাদের দেশেই ভাল, অনেক কম দামে ভালো ভালো চাইনিজ জিনিস পাই’।

আসল বাস্তবতা হচ্ছে এটায়। চীনারা যেদেশ যেমন দামে যেমন পণ্য চায় ঠিক সেই পরিমাণ পণ্য শুধু সে দেশের জন্যই তৈরি করে রপ্তানি করে। রপ্তানি বাণিজ্যে সব দেশকে টপকে নিজেদের বিশ্বের এক নম্বরে রাখার চীনা সরকারের এটা একটা অভিনব কৌশল বললেও ভুল হবেনা। এদের নিজেদের ব্যবহৃত জিনিসের গুণগত মান ওইসব পণ্যের ধারে কাছেও নেই। সবকিছু লিখে শেষ করার মত ধৈর্য এবং সময় সত্যিই অপ্রতুল তাই কিছু জিনিস তুলে ধরলাম :

ট্রাফিক ব্যবস্থা ও গণপরিবহন : চীনাদের ট্রাফিক ব্যবস্থা সত্যিই নজর কাড়ার মত। রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের দেখা মেলেনা তবে অফিস টাইমে কিছু ট্রাফিক পুলিশ তাদের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরে ও একজন ব্যক্তি ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে চলেনা। প্রত্যেক সিগন্যাল এবং সমস্ত রাস্তা সিসি ক্যামেরার আওতাধীন, তাই ট্রাফিক নিয়ম অমান্যকারীকে তাৎক্ষণিক ভাবে ক্যামেরায় ডিটেক্ট করে উপযুক্ত শাস্তির বিধান রয়েছে। সেজন্য বাধ্যতামূলক ট্রাফিক আইন মেলে চলা সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে এরা সবাই মনে করেন। রাস্তায় হাজার হাজার গাড়ি কিন্তু কোন হর্ন এর শব্দ শোনা যায়না। পথচারী যদি একটু অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটেন বা রাস্তা পার হন তাহলে প্রাইভেট কার, বাস সহ অন্যান্য যানবাহনের চালক নিজেরা অপেক্ষা করে পথচারীকে রাস্তা পারের সুযোগ করে দেয়। রাস্তায় বাস, ট্যাক্সি, ই-বাইক, সাইকেল চালানোর সময় কারো ভিতর কোন প্রতিযোগিতা (কে কার আগে যাবে) নেই।



ট্রাফিক সিগন্যাল সহ সমস্ত রাস্তায় কিছুদূর পর পর এমন ক্যামেরা দেখতে পাওয়া যায়

কোন হেল্লার বা অন্য কারো সাহায্য ছাড়া বিশাল বড় বড় বিলাস বহুল পাবলিক বাস একজন মহিলা বা পুরুষ চালকের তত্ত্বাবধানে যথাসময়ে গন্তব্যে আসা যাওয়া করছে। প্রতিবার রাউন্ড দেওয়ার পরপরই গ্যারেজে ঢুকলে দায়িত্বরত ব্যক্তি ১-২ মিনিটের ভিতর বাস গুলোকে ধুয়ে মুছে একবারে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। সবগুলো বাসে জিপিএস ব্যবস্থা চালু করা তাই চালক ইচ্ছে করলেই একজায়গায় দাঁড়িয়ে সময় ক্ষেপণ করবে সে সুযোগ নেই। বাসগুলো সবই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, ভিতরে টিভি পর্দায় সার্বক্ষণিক বিভিন্ন ভিডিও চলে এবং প্রতিটা স্টপেজ আসার আগেই টিভি পর্দায় যাত্রীদের দের সতর্কতামূলক ঘোষণা দেওয়া হয়। ১ ইউয়ান (১২.৫ টাকা) দিয়ে ৫০-৬০ কিগমিঃ মত যাওয়া যায়। তবে যেখানেই নামবেন ওটাই দিতে হবে সেটা এক স্টপেজ পরে হলেও (অন্যপ্রদেশে কম বেশি হতে পারে)। বাসের দরজা গুলো খোলা এবং বন্ধ হওয়া চালক তার সিটে বসেই নিয়ন্ত্রণ করে। সামনের দরজায় যাত্রী ওঠা এবং পিছনের টা নামার কাজে ব্যবহৃত হয়। যাত্রী ওঠার পথে রাখা কিউ আর কোড মোবাইলে স্ক্যান করে, ব্যাংক কার্ড পাঞ্চ করে বা নির্দিষ্ট বক্সে টাকা রেখে ভাড়া পরিশোধের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটা বাসে কমপক্ষে ৪ থেকে ৫ টা ক্যামেরা আছে যেগুলোর মাধ্যমে সমস্ত যাত্রীদের ওঠানামা, ভাড়া পরিশোধ, চালকের সতর্কতা সার্বক্ষণিক কর্তৃপক্ষ তদারকি করেন। বাসে ওঠার পরেই সিটে বসার জন্য কেউ হুড়োহুড়ি করেনা বরং সবাই দাঁড়িয়ে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।



সুসজ্জিত মেট্রোরেলের ভ্রমণের খন্ডচিত্র

মাটির নিচে আছে আরেক পৃথিবী সেখানে মেট্রোরেল গুলো প্রতি ৫ মিনিট পরে পরে ঘুরে আসছে। খুব অল্প সময়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে মেট্রোরেলের জুড়ি মেলা ভার। কর্মস্থল থেকে বাসা শত শত মাইল দূরে হলেও মেট্রোরেলের সাহায্যে খুব সহজেই নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়। প্রতিটা মেট্রোরেলের প্রবেশদ্বার, বের হওয়ার পথে সার্বক্ষণিক চলন্ত সিঁড়ি, পায়ে হেঁটে নামার সিঁড়ি, পাশাপাশি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার নিয়ে ওঠা নামার সুবিধা সহ শীততাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিটা মেট্রো স্টেশনে টিকিট কাটা থেকে শুরু করে বের হয়ে আসার আগ পর্যন্ত আছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ছোয়া। কোনরকম বুদ্ধি বামেলা ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মেট্রোরেল ব্যবহার করা যাত্রীর সংখ্যা অন্যান্য গণপরিবহনের যাত্রীর সংখ্যার চেয়ে ঢের বেশি।

রোড এন্ড হাইওয়ে: রাস্তাগুলো প্রায় সবজায়গাতেই ৮ লেনের। প্রত্যেক রাস্তাতেই ই-বাইক, সাইকেল চালানোর আলাদা লেন সহ পায়ে হেঁটে চলার ব্যবস্থা আছে। সব হাইওয়ে গুলো এক্সপ্রেস ওয়ের আদলে তৈরী, মানে কোথাও গাড়ী না থামিয়ে নির্দিষ্ট লেন ধরে শয়ে শয়ে মাইল উচ্চ গতিতে যাওয়া যায়। হাইওয়ের কিছু কিছু জায়গায় টোল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। টোল গেট গুলো আসার মাইল খানিক আগেই চালকের মোবাইলের এপসে সিগন্যাল দেয় এবং টোলের ভাড়া মোবাইলে পরিশোধ করলেই গাড়ী গেটে আসার কিছুটা আগেই নিজ থেকেই খুলে যায়। যাতে করে ওখানে আসার পরে সময় নষ্ট না হয়। চীনের হাই স্পিড (বুলেট ট্রেন) ট্রেনের কথা সবারই জানা। যেটোতে রওনা হয়ে মানুষ বিমানের মত দ্রুত গতিতে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারে। এদের এখানে আলাদা ভাবে কোন বর্ষা মৌসুম না থাকায় গ্রীষ্মের চেয়ে শীতের দিনে বৃষ্টির আধিক্য দেখা যায়, সেজন্য গ্রীষ্ম মৌসুমে হাইওয়ে সহ সমস্ত রাস্তা ঘাটে বেশি ধুলো ময়লা জমে। এই ধুলো ময়লা পরিষ্কার করার জন্য সবখানেই অত্যাধুনিক কিছু গাড়ী আছে। গাড়ী গুলোর সাহায্যে রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত রাস্তা ঘাট ধুয়ে মুছে এমনভাবে পরিষ্কার করে দেখলে মনে হবে রাস্তা গুলো এইমাত্র তৈরি করা হয়েছে। রাস্তায় পড়ে থাকা গাছের বরা পাতা বা অন্যান্য ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য সেন্সরের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলা কিছু মেশিন আছে, সেগুলো কোন চালক বা অন্য কারো সাহায্য ছাড়া নিজ থেকেই আপন মনে রাস্তা পরিষ্কার করে চলে। ভোরের আলো ফোটার আগেই এসব কাজ গুলো সম্পন্ন হয়।

কংক্রিটের সুউচ্চ পাহাড় কেটে তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে মাইলের পর মাইল টানেল (গাড়ি যাওয়ার রাস্তা), মেট্রো রেলের লাইন এবং সর্বোপরি পাহাড় কেটে অত্যাধুনিক আবাসন বানানোর চিত্র সবসময় চোখে পড়ে। একদিন পথে যেতে যেতে দেখতে পেলাম পাহাড়ের তলদেশে ডিনামাইটের বিশাল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাহাড় কাটার কাজ শুরু হয়েছে এবং মাস দুই পরে সেই সুউচ্চ কংক্রিটের পাহাড় কেটে পরিষ্কার করে সেখান থেকে চলে গেছে দৃষ্টিনন্দন রাস্তা। কোন এলাকায় জনবসতি গড়ে তুলতে চাইলে আগে থেকে জনগণের সমস্ত চাহিদা যেমন রাস্তা-ঘাট, বাজার, পানি-বিদ্যুৎ লাইন, যোগাযোগের যথাযথ ব্যবস্থা শেষ করেই তারপরে সেখানে মানুষ বসবাসের অনুমতি মেলে। নির্মাণ কাজের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় খুবই কম সংখ্যক শ্রমিকের উপস্থিতিতে অত্যাধুনিক সব বিশালাকৃতি যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ের ভিতর সুউচ্চ অটালিকা, দীর্ঘ সেতু, দৃষ্টি নন্দন হাইওয়ে সহ নজর কাড়া সব স্থাপত্য তৈরি হচ্ছে। নদীর পাড় গুলো বড়বড় কংক্রিটের পাথর দিয়ে এত সুন্দর ভাবে বাঁধানো যে হাজার বছরেও সেগুলো কিছু হওয়ার নয়। প্রতিটা নদীর পাড় দিয়ে চলে গেছে দৃষ্টিনন্দন সবুজ অরণ্যে ঘেরা অত্যাধুনিক পার্ক এবং মানুষের হাঁটার রাস্তা।



রাস্তা সহ সমস্ত অলিগলিতে সেট করা অত্যাধুনিক এসব ক্যামেরা আপনার চলাফেরাকে সার্বক্ষণিক রেকর্ড করবে।

সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরার আওতা: চুরি-ছিনতাই, বাটপারি, ব্ল্যাকমেইল ছোট বড় যেকোন অপরাধ করে এখানে কেউ রেহায় পায়না তাই ওগুলো সংঘটিতও হয়না। হবে কি করে? প্রতিটা মানুষের প্রতিটা পদক্ষেপ ক্যামেরায় রেকর্ডিং হচ্ছে। নিজের বাসা থেকে বের হয়েই আপনি ক্যামেরায় ট্র্যাকিং হতে থাকবেন আর সেটা চলবে যতক্ষণ না আবার আপনি বাসায় ফিরছেন ততক্ষণ। কোথায় নেই ক্যামেরা? প্রতিটা অলিগলি, মাঠ, পাহাড়, নদীর কিনারা, পার্ক, সুপার মল সবখানেই ক্যামেরা আপনাকে ডিটেক্ট করবে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে এত ক্যামেরা ট্র্যাকিং সিস্টেম আছে কিনা আমার জানা নেই। তাই এখানে কারো কোন জিনিস হারানো গেলে সেটা খুঁজে বের করা যত সহজ সাথে মানুষের নিরাপত্তাও পুরোপুরি নিশ্চিত। সবজায়গাতেই মানুষের চলাচল নিরাপত্তার চাঁদরে ঘেরা এবং কোন রকম অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াই নিরাপত্তার বাহিনীর সদস্যদের (পুলিশ, সেনাবাহিনী) টহল চোখে পড়ে। সেজন্য একজন মহিলাও এখানে রাত ১২ টার পরে আরামচে সাইকেল চালিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফেরে।

কেনাকাটা: শ্রমিক থেকে উচ্চবিত্ত সবাই স্মার্ট ফোন (আইফোন, স্যামসাং, অল্প, হুয়াউয়ে) ব্যবহার করে। কাছে একটা ফোন থাকলে কেনাকাটা বা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য আর কোন কিছুর দরকার পড়ে না কারন এখানে ক্যাশ টাকার কোন লেনদেন নেই বললেই চলে। তাই সেটা যত বড় বা ছোট পরিমানের লেনদেন হোক না কেন। সরাসরি ব্যাংকের সাথে যুক্ত উইচ্যাট (চাইনিজদের সর্বাধিক ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম), আলি-পে (আলিবাবা পরিচালিত) এপস এর মাধ্যমে সমস্ত কেনাকাটা কোন বামেলা ছাড়াই মোবাইল ফোনে হয়ে যাচ্ছে। এই দুটো মোবাইলের এপস এর কথা একটু আলাদা ভাবে বলতেই হয়। এমন কোন দরকারী কাজ নেই যে এই এপস দুটোর সাহায্যে করা যায় না। যেকোন পরিবহনের (বিমান থেকে ট্যাক্সি) অগ্রিম টিকিট বুকিং, হোটেল বুকিং, রেস্টুরেন্টে সিট বুকিং, প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সহ অন্যান্য অনেক সুবিধাদি, এছাড়া সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ এবং জনপ্রিয় মাধ্যম সহ যেকোন সময় যেকাউকে যেকোন পরিমান তাৎক্ষণিক আর্থিক লেনদেনের নির্ভরযোগ্য দুইটি এপস হচ্ছে উইচ্যাট এবং আলিপি। প্রতিটা চীনা নাগরিকের এই এপস দুটো ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনকে অনেক বেশি ছন্দময় এবং সহজ করে দিয়েছে। রাস্তার পাশে সুসজ্জিত ভাবে সাজানো ব্যাটারী চালিত ই-বাইক।

অনলাইন শপিং বা অন্যান্য যেকোন কেনাকাটা করার জন্য শুধু একটা মোবাইল ফোনই যথেষ্ট এবং এর ফলে যে সুবিধাগুলো আছে সেটা হল নেই টাকা ভাঙতির বামেলা, ছেড়া অচল এবং জালটাকার বুদ্ধি, সর্বপরি মানিবাগ নেওয়ার বামেলা। টাওবাবা, টিমল, ফিনদউদউ, জে ডি ডট কম নামে কিছু অনলাইন

শপ আছে যেগুলোর মাধ্যমে ঘরে বসে সুই থেকে শুরু করে প্রাইভেট কার ও কেনা যায়। ঘরে বসে অর্ডার করার এক থেকে দুই তিন দিনের ভিতর (নির্ভর করে অর্ডারকৃত দোকানের দূরত্বের উপর) ডেলিভারি পাওয়া যায়, নেই কোন দরদামে ঠকার ভয়। কারন দাম যাচাই করে এবং গুণগত মান দেখে কেনা যায়। ডেলিভারি পাওয়ার পর ক্রয়কৃত মালামালে কোন ত্রুটি (পরিবহণ জনিত কারণে ভেঙে যাওয়া বা পণ্যের গুণগত মানের পরিবর্তন হলে) থাকলে সেটা বিনা পয়সায় পরিবর্তন অথবা টাকা ফেরত নেওয়ার সুযোগ আছে। সুপার মল থেকে শুরু করে ছোটখাট প্রায় সব রকমের দোকানের হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাই সকালের নাস্তা, দুপুরের এবং রাতের খাবার থেকে শুরু করে যেকোন প্রয়োজনীয় জিনিস মোবাইলে অর্ডার করার পরপরই খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনার বাসায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক দোকানের কিছু কর্মী নিয়োজিত আছে। সবরকমের ইন্টারনেট ডাটা এখানে অনেক সাশ্রয়ী হওয়ায় যেকোন সহজে ভালো মানের ফাইভ জি (৫এ) নেটওয়ার্ক সেবা পেয়ে থাকে। ২৯ ইউয়ান অর্থাৎ দেশী টাকায় ৩৫০ (আমি উক্ত প্যাকেজ ব্যবহার করি, অন্যান্য ক্ষেত্রে সামান্য কিছু কম বা বেশি হতে পারে) এর প্যাকেজ দিয়ে সারামাস নির্বিঘ্নে আনলিমিটেড ফোন কল এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। কারণ ডিজিটালাইজড সবকিছুকে সবার নির্বিঘ্নে উপভোগ করার জন্য সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা অতীব জরুরী।



চাইনিজ সবজি বাগানের একাংশ

চাইনিজ কৃষিঃ কৃষিতে এদের অভিনব সাফল্য। পরিসংখ্যান ঘাটলে দেখা যায় সীমিত চাষযোগ্য কৃষি ভূমি নিয়ে এই বিশাল জনসংখ্যার দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা মেটানো খুবই কঠিন এবং চ্যালেঞ্জের। তাই বাধ্য হয়েই কিছুটা ভিন্ন ধাঁচের উন্নত কৃষি নির্ভর পদ্ধতি এদের অনুসরণ করা লাগে। কৃষি জমি প্রস্তুত, বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল কেটে প্যাকেটজাত করা সবটায় আধুনিক যন্ত্রপাতির ছোয়ায় খুবই সহজে হয়ে যাচ্ছে। চাহিদার তুলনায় চাষ যোগ্য কৃষি জমির অপ্রতুলতার কারণে বাধ্য হয়ে এরা হাইব্রিড শাকসবজি চাষ করে। একবার আমাদের পাশের একটা কৃষি ফার্মে গিয়ে দেখেছিলাম সব সবজি গাছ গুলোতে বাম্পার ফলন, সবজির ভারে গাছগুলোর মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষমতা টুকু নেই। কৃষি জমি থেকে শুরু করে সব জমাজমি সরকারের তত্ত্বাবধায়নে থাকে, সরকার থেকে নির্দিষ্ট সময়ের লিজ নিয়ে তবেই কৃষক সহ অন্যান্য জনগণ ব্যবহারের অনুমতি পায়। সেজন্য জমিজমা নিয়ে কারো ভিতর কোন বিরোধ নেই।



রাস্তার দুপাশ দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে রাখা আছে এসব সাইকেল

পরিবেশ বান্ধব ই-বাইক, সাইকেল, প্রাইভেট কারঃ রাস্তার দুইপাশ দিয়ে রাখা আছে বিভিন্ন কোম্পানির প্রদান করা সারি সারি ই-বাইক, সাইকেল আর প্রাইভেটকার। সবগুলোই সেলফ সার্ভিস মানে নিজেদের ড্রাইভ করতে হবে, মোবাইলের এপসের মাধ্যমে পরিবহনের গায়ে লাগানো কিউ আর কোর্ড স্ক্যান করলেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে লক খুলে যায়। তারপর পথচারী নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছিয়ে সেগুলোকে আবার লক করে রাখে এবং যাতে করে অন্য যেকোন আবার সেটাকে পুনরায় ব্যবহার করতে পারে। প্রাইভেট কার ও একই ভাবে রাস্তার পাশে নির্দিষ্ট স্থানে পার্ক করে রাখা আছে, যারা ফ্যামিলি সহ একটু দূরে কোথাও যেতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটা খুবই উপযোগী। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা লাগবে।

পাবলিক বাস, ব্যক্তিগত গাড়ী, ই-বাইক, সাইকেল এর অধিকাংশই ব্যাটারী চালিত অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব। প্রতিটা কোম্পানির বেশ কিছু কর্মী আছে, তারা এপসের মাধ্যমে জানতে পারেন সাইকেল বা গাড়ীগুলো কোথায় রাখা আছে। তাদের মাঝরাতের ডিউটি হল, প্রতিটা সাইকেল, ই-বাইক, গাড়ীগুলো আবার জনবহুল এলাকার নির্ধারিত স্থানে রেখে যাওয়া এবং ব্যাটারী পরিবর্তন করে ফুল চার্জের ব্যাটারী দিয়ে যাওয়া। যাতে করে অফিস টাইমে পথচারীরা সবাই পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিবহন হাতের কাছে পায়। এগুলোর ভাড়াও খুব কম এবং স্ক্যান করার পর থেকেই ভাড়া কাটা শুরু করে আর লক করলেই বন্ধ হয়। সাইকেল, ই-বাইকের ক্ষেত্রে ঘন্টায় ১-২ ইউয়ান এর মত আর গাড়ীর ক্ষেত্রে সেটা দূরত্ব ও সময়ের উপর নির্ভর করে।



রাস্তার পাশ দিয়ে অল্প দূরত্ব পরপর নির্দিষ্ট স্থানে রাখা সেলফ সার্ভিস প্রাইভেটকার।

কর্মক্ষেত্রে নারীরাঃ রাস্তায় বা বিভিন্ন শপিং মলে সবখানে মহিলাদের আধিষ্ঠ্য দেখা যায়, এগুলো দেখলেই সহজেই আচ করা যায় এখানে মহিলারা অনেক বেশি কর্মক্ষম। সমস্ত দোকান পাট, বড় বড় শপিং মল, বাস, ট্রাক, মেট্রো সবকিছু মহিলাদের তত্ত্বাবধায়নে চলে। নির্মাণ কাজের শ্রমিক হিসাবেও পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অধিক উপস্থিতি লক্ষনীয়। একজন মহিলা যখন কয়েক টন মালামাল সহ বিশাল আকৃতির ট্রাক নিজ হাতে দক্ষতার সাথে চালনা করে নিয়ে যায় তখন সহজেই অনুমেয় মহিলারা এখানে কতটা কর্মক্ষম।

পাবলিক পরিবহন এবং পাবলিক পেসে (পার্কসহ বিভিন্ন যোয়ার জায়গা) কোথাও হকারস দেখতে পাওয়া যায়না। কোথাও কোন ভিয়ারি চোখে পড়েনি তবে মাঝেমাঝে রাস্তার পাশে জনবহুল কিছু এলাকায় শারীরিক ভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র (ভায়োলিন, বাঁশি ইত্যাদি) বাজিয়ে বা নিজের গলায় স্পিকারে গান করতে দেখেছি। কারও মনে চাইলে তাদের সামনে রাখা হজ কোর্ড মোবাইলে স্ক্যান করে কিছু টাকা দিয়ে চলে যাচ্ছে।

দেশকে উন্নতির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে যেটা সবচেয়ে বেশি উপযোগী সেটা হল রিসার্চ এবং টেকনোলজি এবং এটাতে ও চীনারা এখন বিশ্বের মধ্যে এক নাম্বারে অবস্থান করছে। একজন গবেষক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক কে এরা অনেক বেশি মূল্যায়ন করে। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বেশিরভাগ উন্নত দেশকে টপকে যাওয়া চীনের এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

অজয় কান্তি মন্ডল

গবেষক, ফুচিয়েন এগ্রিকালচার এবং ফরেস্ট্রি ইউনিভার্সিটি
ফুচিয়েন, চীন



My China Story

In my perspective, China is an ancient country full of mysteries. She has thousands of years of history, glorious culture, and civilization. Yet now, the Chinese are using their hard work and wisdom to create more social value for both China and the world.

Now that I recall, my story with China has begun when I was still an innocent kid. While I was running around the street playing, the word China had already appeared in my life. The Sentence “Made in China” was printed in the back of almost everything I ever owned, no matter if it was a toy train, a toy car, or even a transformer. Of course, I had no clue what kind of place would China be like, how would this land of mystery look like, and what are the stories behind, but all that I can remember is that those toys have been there for my entire childhood and they have brought nothing but joy to me, and of course they have become happy moments of my life. In the meanwhile, the word China is like an invisible seed, secretly planted in my heart.

As I slowly grew up, I have had a better understanding of everything, and also, I had more knowledge of belief upon my religion. The book “Quran” has taught me how to face life, how to have self-discipline and most importantly is to teach me how to keep learning. There is a saying from the ‘Quran’: “There is no limit when it comes to learning, you must overcome all the difficulties for studies, and go to the ‘Far East China’ to seek for more knowledge.” My curiosity towards China is unlimited. She is like a massive treasure that kept attracting me. I wanted to visit this country so badly, I wanted to see what she was like, listen to the way she sounds and feel her warmth. By this time, the seed named ‘China’ is trying to burst out of the soil.



And there was once where my father visited China because of work, he returned with presents from China. And for the first time in my life, I get to peek at a tiny tip of China, felt the original Chinese product with my own hands, and see the Chinese characters. In my eyes, every Chinese character was like a beautiful poem, or a gorgeous painting that hides a story behind them. I feel I was one step closer to China, I felt like as she was in front of me and she has revealed herself behind a mask, showing that mysterious part of hers as she was waving at me and calling me. And just like that, I hide my cravings towards china deep in my heart, and tried my best to seek opportunities to understand more culture about China as this craving has been by my side for my entire childhood. The Confucius Institute is a school that is specialized in teaching Chinese culture in my country, after finishing my high school, I came across an opportunity in which The Confucius Institute is organizing a summer camp in China.

I was so thrilled to hear about this news, and after negotiating with my parents I signed up for this program and I went to a city in China named “Kunming”, this city is also known as the “spring town”. These 15 days-journey made me enjoy this city so much. It was Sunny every day, with clear skies and green trees, grass fields and colorful flowers, the city was full of life. The fresh air made every leaf and each flower shows their best as it was a showcase. The leaves shine through the sunshine, and the flowers glow as well, even the air was full of sweetness. We visited many places, CuiHu Lake, DianChi Lake, the ethnic minority group villages and also to ShiLin Forest.... There are just so many places to visit and so many cultures to interact with. The buildings and bridges with traditional Chinese taste made it felt so much better. The Chinese are absolutely warm and welcoming, they treated us with a different variety of cuisines and each of them are unique from one another. There isn't a place which I didn't like about this place, as I found myself amazed in this country by its views, and culture.



This journey to Kunming has finally revealed the mysterious scarf off of China's face and I finally have the chance to see the inner beauty of it. I'd admit it, I am a man with a big ambition, I wasn't satisfied with what I saw and knew. I wanted to know more about China and know more about her history, her culture and I wanted to communicate with her in her language. But coming to China to study isn't an easy thing to do, this requires many different tests and levels until a low amount of lucky students would gain the opportunity to travel to China and study. So, I started working hard, and set a goal for myself. After a long time of hard work, I finally got the government scholarship and I have this opportunity to return to the land that attracts me most. After my arrival in China, I spend 10 months studying in a foundation course. In the 10 months, I studied so hard, no matter how hard it is, I tried my best to learn. I know that this is a once in a lifetime opportunity and that I could not just let it go into waste like that. I had to work harder because I was having trouble understanding road signs and the language barrier I have with the locals. pays off at the end, after 10 months, I could understand words such as shop, hotel, bank and I could understand much more than just hello and goodbye. What's more is that I got recommendation letters to two universities in china because of my good grades. They are The Communication University of China and Sun-Yet Sun University, and after doing some considerations, I've chosen SYSU which is located in another city named Guangzhou, and this is a school with a long history and she has experienced how China grew.

When I return to China once again as a University student of SYSU was the moment when I feel it was the time when I actually made contact with China. This time was as a brand-new identity instead of a tourist. And that seed named 'China' has finally burst out of the surface and it is willing and ready to grow.

Although I have had enough preparations, but living in a new environment all alone can be quite a challenging thing to do. I must work harder than before as Chinese isn't a language that is easy to master. The more I learn, the harder the course got, and this is when I realize that I still got so much to learn. Only by learning and trying to adapt the life in China then I can blend in better and understand China in a better way. On the bright side, I am not as helpless as in the beginning, and I can communicate with my friends in Chinese, express myself in a better way and I could work and study as well as travel around as if I was a local, which can be a good thing because there are so much more I haven't discovered from China.

I am still studying in China; perhaps I would consider staying here too. There is still so much uncertainty, but one thing for sure is that no matter where I will be in the future, my love towards china will not fade a bit. And my story with China will never stop, there are so much more for me to see and to discover. And this is my never-ending story with China.

Rahman Md. Muhtasimur
Student, Sun-Yat Sen University

কবিতা

জলফড়িং

সৌরভ রেজা, স্থপতি, ঢাকা

ডুব
গভীরে খুব।
তলিয়ে যাচ্ছি ধীরে।
আট কুঁঠুরি নয় দরজা
থৈ-থৈ করে পদ্মা নদীর জলে।
ছোটবেলায়, দাদু আমায় ডাকতো ‘গঙ্গা ফড়িং’।
জলের তলে এবার আমি মস্ত একটা ‘জলজ ফড়িং’।
শরীরটা খুব হালকা এখন, মাথার ওজন পাহাড় সমান।
চোখের সামনে ফিলিম চলে, আদ্যোপান্ত জীবন আমার।
মা কাঁদবে, শুদ্ধ বাবা, সূর্যোদয়ে জাগবে পাতা বেলীর চারাটার।
মাসুদের ধার শোধ করিনি, বোনের বইটা কিনতে পারিনি, হয়নি বলা তোমায় কথাটা।
ফুসফুসে কোন বাতাস নেই আর, জলে সয়লাব শ্যাওলা মাখা।
হৃৎপিণ্ড ঢাক বাজিয়ে ক্লান্ত এখন, শ্রান্ত অবশ চোখের পাতা।
বুকের ভেতর কষ্টটা নেই, ঘুম পাচ্ছে নেশার ঘোরে।
কিসের শব্দ আসছে ভেসে গহীন থেকে, খুব জড়ানো।
চারপাশটা সবুজ ছিল, কমছে আলো-বাড়ছে কালো।
শুঁকতে আমায় মাছগুলো সব ভীড় জমালো।
শীত লাগছে, হীম বাড়ছে, খুঁজছি শয্যা।
তাল গোলেতে গুলিয়ে ফেলছি
ভাবনাসজ্জা, প্যাঁচ লেগে হোক ভো কাট্টা।
এখান থেকে ডুবসাঁতারে, ঘুমসাঁতারে
ভেসে ভেসে কোথায় যাব
কোন সাগরে মিশে?
আর পারি না,
এবার মুদি
চোখ।

পা নয় ঘাড় ধরুন (সনেট)

আকিব ইরফান

আয়েশে খায়েশে কাটছে জীবন খুব,
অপরাধী চারপাশে তবু কবি চুপ।
কথা চলে দিন-রাত, শুধু হায় হায়,
ভাবনায় খেলা করে, আছে কী উপায়?
শব্দ চোয়ালে কাঁধের জোয়াল নিয়ে
এগিয়ে এসেও যদি থেমে যেতে হয়!
ইচ্ছেরা সব আটক ক্ষমতা দিয়ে,
তাই ঘৃণা করতেও কারো খুব ভয়!

নিরাপদ জনপদ সকলের দাবী!
তবুও হয়না কেনো, কার হাতে চাবি?
দাবী আদায়ের নিয়মিত কিছু বাণী,
প্রতিবাদ প্রতিরোধে সবে টেনে আনি।
বদলাতে হবে ক্ষমতার পায়ে ধরা,
ঘাড় ধরে হোক এবারে সমাজ গড়া।



মহাবীর

মো: আসাদুজ্জামান

কোথা আছ হে মহাবীর!
ভুলিছ কি পথ ভ্রমে,
কোথা তোমার জুলফিকার, বোরাক
তাজি দুলদুল, আজীবন সৈন্য
ডঙ্কা ভেরীর শব্দ তালে-সে হুন্দ
বাঁধনহারা উন্মাদ-এক যে ছিল
শত্রু মনে ভয় জাগানিয়া- নৃত্য!
তামাম দুনিয়ায় দেখি একি দৃশ্য
কালের কলসে-মুসলিম নিধন কু-চক্রান্তে
কাফের মুশরেক সব সঙ্গবদ্ধ।
একি যন্ত্র একি মন্ত্র-গোলোক ধাঁধা
লেবাসে আপাদমস্তক পরিপূর্ণ,
আলাদা সব জিহ্বা-বক্ষ!
সত্য দ্বীনে বিশ্বাস যার,
সেই যাতাকলে পিষ্ঠ।
ভন্ডের আজ সব রাজত্ব
ইহুদি-নাসারা-মুশরেক তন্ত্রে
মুসলিম ললাটে এ কি অদৃষ্ট!
কেঁদে মরিছে সারা জাহানের মুসলিম সব
ভারত-কাশ্মীর-সিরিয়া-ইয়েমেন
আফ্রিকা-ইরাক-ফিলিস্তিন!
হে মহাবীর! কোন গুলশানে গুলজার হয়ি,
তুমি আনজামহীন।

এখনিই সময়
আঁখি খোলো, নেশা ছাড়
প্রভুর আশীর্বাদ মাথায় করে
তামাম-সামান-তান্জাম নিয়ে,
ভাঙ্গো সব কাফের মুশরেক-জিজির
দরাজ হস্তে বে-দরদ দিলে -
চালাও খঞ্জর-কামান-বর্ষা-মিসাইল
বাঁঝরা কর ও ঐ পাষণ্ড চিত্ত,
মাটিরে কর মুক্ত, এ কুল মুলুকে
রচনা কর শান্তি-সাম্য, ফিরিয়ে আন শৃঙ্খল
সবুজে শ্যামলীমায় ভরে উঠুক,
আবার এ বিশ্ব।
ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে,
তোমার হাতেই প্রতিষ্ঠা পাক-
সমান অধিকার চিত্ত
হে বীর! এমন কানুন আনো
এ পৃথিবীর বুকে কশ্মিনকালেও
এ উচ্ছিষ্ট সকল না হয় যেন আর-জন্ম।



আমায় নিয়ে ভাবনা

রেজাউল করিম

বাঁধন

আবু সাঈদ

তোমার সঙ্গে একটি সন্ধ্যা-
আকাশ ভরা তারা,
সঙ্গে ছিল জোনাকি পোকা
জোৎস্না দিল সাড়া;
হাসনাহেনার স্নিগ্ধতায়
সুরভিত হয় মন
শিউলী ফুলের সুবাস ছড়ায়
সুশোভিত করে মন!
চারিদিকে খুশির তাল
ঢুলের ধুম ধুম;
আবছা অন্ধকারে আজ
বেদনা হল গুম।

রং তুলিতে সাজিয়ে নিলাম
মনের যত সুখ
খুশিতে আজ আত্মহারা
থাক না যত দুখ!
শিউলী ফুলের মতো গাঁথে
দেব আনন্দমালা,
মেহেদী পাতায় রাঙিয়ে নেব
সুশ্রী দেহ সারা।

মলিন হবে আছে যত
হৃন্দহীনের দল;
মন আকাশে নামবে জুয়ে
(অবার ধারায়) পরিতৃপ্তির চল!
পারাপার, কাছে আসা
প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা,
হাত ধরে দেখি চল
মধুর এই ভূবন,
তুমি আমার, আমি তোমার
খানিকের জীবন।



ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অটোমেশন,
চাংশা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চাংশা, হুনান, গণচীন।

আমার জীবনের নেই দাম
আমার কষ্টের সমাধান
আমার নেই কোনো ক্রেশ, মিথ্যা সান্তনা
জয় বাংলা শ্লোগান।

আমার জরাজীর্ণ হৃদয়
যেনো অজানা কোনো ভয়,
আমি পাপে লিপ্ত, নির্দয়।
কখনো নিজের নামে দেই নি মামলা....
শুধু ভালো হবার অভিনয়।

আমার সপ্ন দেখতে মানা
আমার সুখ যেনো অজানা
আমার ফেসবুক ভরা অশ্লীল কमेंট,
প্রতিবাদ করতে মানা।

আমার বোন আমার জান
মা কলিজা, আমার প্রাণ।
মাল বলি যাকে, সে তো অন্যের বোন...
তাতে নষ্ট হয় না মান।

আমার বাবার কণ্ঠে কেনা ফোন
আমার অশ্লীল ব্রাউজিং
আমি খুঁজে ফিরি অন্যের দোষ,
আমার হিপোক্রট মানসিকতা, আমি শুধু
নির্দোষ।

আমার কুটিল মনের কথা,
কেউ জানে না নৃশংসতা।
ভাবি না অন্যের নিরবতা,
আমি রাতদিন শুধু লালসার চিন্তা,
চরিতার্থ করার আকুলতা।

আমার মানসিক অবক্ষয়
আমি কাউকে করিনা ভয়
আমার মুখে শ্লোগান, জয় বাংলা,
আইন, আমার জন্য নয়।

আমার দেশ চালায় সে তো নারী,
তাহার সিকিউরিটি ভরা বাড়ি।
সে কি শোনে না আহাজারি,
ধর্ষিত হচ্ছে সব জায়গায়,
রাস্তা, স্কুল, কিংবা গাড়ি।

আমার ঘুণে ধরা এক জাতি
আমার বিচারের অবনতি।
পুলিশ তুমি কি ধর্ষকের পক্ষে,
করছ ক্ষমতার কাছে নতি।

আমার ধর্ষনের সেধুরি,
নারীর কান্না আহাজারী।
আমার কানে ঢোকে না, "আত্মচিকিৎসা",
ধর্ষনের পর, তাদের জীবন নেয়া কাড়ি।

আমায় থামবে কে বলো,
আমার বিচার যেনো হলো।
কয়েকটা মাস জেলের ভিতর,
সহজেই জামিন দিলো।

আমি সুশীল, নারীবাদী,
হয় সাধারণ ধর্ষণ যদি।
আমি চুপ করে থাকি, চোখে কালো কাপড়
বাধি।
শুধু ধর্মীয় লোক ধরা পড়লে, আমি যে
প্রতিবাদী।

আমি প্রতিবাদ মিছিলে নাই
আমি জেল পুলিশ ভয় পাই
আমার ফেসবুক শুধু প্রতিবাদের স্থান,
সুযোগ না পেয়ে সাধু তাই।

পেপার খুললেই যেনো ধর্ষক,
আমি হয়ে গেছি নির্বাক।
শত শত অন্যায় দেখে দেখে ক্লান্ত
আর হইনা যে অবাক।

আমি চিন্তায় পরে রই,
আমার স্বাধীনতা আজ কই,
নিজে নিজে লজ্জিত হই।
যখন রাজাকার আজ মৃত সবাই,
তবু কেনো নিরাপদ নই।

আমার মুক্তিযোদ্ধা রা কই,
আমি নির্ধুম জেগে রই।
তোমার স্বাধীন দেশে এখনো নব্য হানাদার,
আরেকটা যুদ্ধ চাই।

বৃদ্ধাশ্রম

মাস্টার উদ্দিন

TIME

Rayhan Tanvir

There will be a time,
When you will be called mine.
When the sun will lie down
To the heart of the mountain,
Blue sky will turn to pale tint of orange
In the pile of orange,
You may find some white
feathers.
Your face will be shimmered with that glitters.
While the nature will be so calm,
Just like your eyes,
Your hair will be played gently in the air
And calmly you'll be keeping it away
To enchant the beauty.
I'll tell you to come that time,
Hold my hand and mingle in dark to the skyline.

Lecturer

School of Mechanical & Electronic Engineering
East China University of Technology

FIGHT

Shemon Saha

Fight! Fight! Fight!
Only Their Anthem of Life
Secure Others Life
They Secure Their Own Life's
They are the Fighters
They are Martyrs Unbelievable Their Looks
They are Wearing A Mask
Symbolizes White to Peace
They are the Real Hero
Serve the Nation
May You Live Long You are the Martyrs
You are the Army
Salute You
You All Blooms in Our Heart
We All Take Head Down
To Respect and Speak
'Doctors Jia You'

MBBS Student, Capital Medical University
Fengtai, Beijing

তুই তো কপালপোড়া, সন্তি করে বল মা-
তোর পেটের সন্তানের যখন এতটুকু মায়া
নেই
ফেলে আসে তোরে আশ্রমের বৃদ্ধে, কেন
করিস তারে ক্ষমা?
হয়ত তোর বয়স চল্লিশ পেরিয়ে ষাট কিংবা
অশীতিপর বৃদ্ধা
তাই বলে এই হবে তোর গর্বে থাকা বৎসের
তোর প্রতি শ্রদ্ধা?
তোর রুগ্ন-ভগ্ন এই শরীর বোঝা মনে হয়
তার
হায়! এই বুঝি মায়ের প্রতি সন্তানের বিচার?
কাঁদিসনে মা, আর কী-ই বা বলতে পারি
তোকে?
কলম কাঁপতে থাকে এমন হতভাগী সব
মায়ের শোকে
বৃদ্ধাশ্রম, আহা! কলিজায় লাগে এই নাম
হাজারো মায়ের তিক্ত অশ্রুতে সিঁজ এই ধাম
এই কালে মায়েরে তোরা যেসব ছেলে বলিস
হতচ্ছাড়া বুড়ি
বল হে জন্মকালে কোন সে রমনী রেখেছিলো
তোকে স্তনবক্ষে জড়ি?
শত কষ্টের কিঞ্চিৎও তুই দেখিসনি হে,
এই মায়ের গর্ভেই একটি ভ্রূণ থেকে
ক্রমবিকাশী শিশু
আর এই মায়ের জরায়ু পথেই এসেছিলি
প্রথম, ওহে প্রাণ্ড
জন্মের পর তুই ছিলি এক পঙ্গু মত অচর শিশু
অথচ মা আগলে রেখে তখন বলেছিল, এই
আমার পবিত্র যিশু
তোর মলমূত্র সাফ করিতে মা কখনো বলেনি
হতচ্ছাড়া ছোঁড়া
আগলে রেখে বক্ষে, বড় করেছিল হায়
শুনতে পুত্রের মুখে কানারোঁড়া
তুই সেই শিশু আজ মায়েরে ভাবিস দুনিয়ার
সব বোঝা!
মৃত্যুশয্যায় শোয়া মায়েরে কেন দিস এই
বিষফোঁড়া লজ্জা?
মনে রাখিস হে,
যেজন নিজ মায়েরে বলে হতচ্ছাড়া বুড়ি-
সেই প্রাণ্ডও একদিন হবে খাপছাড়া বুড়া!
মায়ের অশ্রুর কারণ সেদিন বুঝি যখন
পৌছবি তুই ষষ্ঠির বয়ঃক্রম
সেদিন জীর্ণদশায় সন্তান তোর পাঠাবে
তোরে নিজ মায়েরে রাখা বৃদ্ধাশ্রম!

গুয়াংজু শহরে অবস্থিত ১০ টি দর্শনীয় স্থান

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমির একটি দেশের কথা বলতে গেলে তার মধ্যে চায়না অন্যতম। এই দেশটি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, তেমনি আধুনিকতার ছোঁয়াতে হয়েছে নয়নাভিরাম। কি নেই এই দেশে! সবুজ মাঠ থেকে পাহাড়, মরুভূমি থেকে বরফের চাদরে ঢাকা পর্বত, রূপালী নদী থেকে নীল সাগর, সুউচ্চ দালান থেকে শুরু করে আনন্দ বিনোদনের সকল ব্যবস্থা, রাতের মনোমুগ্ধকর আলোক সজ্জা আর সুস্বাদু সব খাবার, এই যেন একই অঙ্গে অনেক রূপ। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ছুটে আসেন শত শত প্রাকৃতি প্রেমী মানুষ। চায়নার সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টটি গুয়াংজু শহরে অবস্থিত। তাই বলা যেতে পারে গুয়াংজু হল চায়নার প্রবেশদ্বার। এছাড়াও গুয়াংজুকে বলা যেতে ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশ সহ বেশিভাগ বিদেশীদের আনাগোনা এই শহরে। বড় বড় খুচরা আর পাইকারী মার্কেট ছাড়াও এই শহরে ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর দর্শনীয় স্থান তা অনেকের কাছেই অজানা। তাই আমাদের এবারে আয়োজন গুয়াংজু শহরে অবস্থিত ১০ দর্শনীয় স্থান :

ক্যান্টন টাওয়ার

গুয়াংজুয়ের ল্যান্ডমার্ক হিসাবে বিখ্যাত স্থাপত্য হল ক্যান্টন টাওয়ার (গুয়াংজু টাওয়ার) যা অবস্থিত পার্ল নদীর দক্ষিণ তীরে। এটি চীনের সর্বোচ্চ টিভি টাওয়ার এবং বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ। এটির উপর থেকে দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে পুরো শহর দেখার সুযোগ। টাওয়ারের অভ্যন্তরে রয়েছে দুর্দান্ত সব বিনোদনমূলক আইটেম, সুস্বাদু খাবার সহ রোমান্টিক রেস্তোরাঁ, শপিং মল এবং ওয়াক্স জাদুঘর। এই টাওয়ারে বেশ কয়েকটা স্তরে রয়েছে, যাতে উঠতে গুনতে হয় ১৫০ থেকে ৩৮৮ ইউয়ানের মত।

ক্যান্টন টাওয়ারে কীভাবে যাবেন?

মেট্রোরেলের লাইন ৩ দিয়ে যেয়ে ক্যান্টন টাওয়ার স্টেশন নেমে প্রস্থান করতে হবে এ এক্সিট দিয়ে

খোলা থাকার সময়ঃ ক্যান্টন টাওয়ার খোলা থাকে ০৯:৩০ থেকে ২২:৩০ পর্যন্ত

টিকিট কাটার সময়ঃ ০৯:৩০ থেকে ২২:০০ পর্যন্ত

টিকিটঃ

- ক্লাউড এবং স্টার পর্যবেক্ষণ ডেক = ১৫০ ইউয়ান
- স্কাই ড্রপ = ১৮০ ইউয়ান
- বাবল ট্রাম = ১৮০ ইউয়ান
- ক্লাউড এবং স্টার পর্যবেক্ষণ ডেক + ৪৫০ লুকআউট + স্কাই ড্রপ = ২২৮ ইউয়ান
- ক্লাউড এবং স্টার পর্যবেক্ষণ ডেক + ৪৫০ লুকআউট + বাবল ট্রাম = ২৯৮ ইউয়ান



ফ্লাওয়ার স্কয়ার

গুয়াংজু শহর ফুলের শহর নামেও পরিচিত। আর এই নাম কে আরো বেশি স্বার্থক করে তুলেছে ক্যান্টন টাওয়ারের অপর পাশে অর্থাৎ পার্ল নদীর উত্তর তীরে ৫৬০০,০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত ফ্লাওয়ার স্কয়ার। যা গুয়াংজু পিপলস পার্কের চেয়ে ১০ গুণ বড় এবং ২৫০ মিটার প্রশস্ত। নদীর তীরে বিভিন্ন রঙের ফুল, গাছগাছালি, পাখি, রাতের আলোক সজ্জা, মিউজিক ফাউন্টেন ফুটে তোলে এক নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য। ফ্লাওয়ার স্কয়ারের পাশেই অবস্থিত গুয়াংজু অপেরা হাউস, গুয়াংডং নতুন জাদুঘর এবং গুয়াংজু আন্তর্জাতিক ফিনান্সিং সেন্টারসহ চারদিকে রয়েছে সুউচ্চ মোট ৩৯ টি বিল্ডিং। এছাড়া রয়েছে পার্ল রিভার ক্রুজে পার্ল নদীতে ৭০ থেকে ১১০ মিনিট ভ্রমণের ব্যবস্থা সাথে মজাদার রকমারি খাবার।

ফ্লাওয়ার স্কয়ার কীভাবে যাবেন?

এ পি এম মেট্রোলাইন দিয়ে মাত্র ২ দিয়ে ক্যান্টন টাওয়ার স্টেশন থেকে ফ্লাওয়ার স্কয়ারে যাওয়া যায় অথবা সরাসরি মেট্রোলাইন ৩ দিয়ে গিয়ে ঝুবিং নিউ টাউন স্টেশনে নেমে প্রস্থান করতে হবে বি১ অথবা এ২ এক্সিট দিয়ে তারপর সামনের দিকে ১০ মিনিট হাঁটতে হবে।

ফ্লাওয়ার স্কয়ার টিকিটঃ ফ্রি

পার্ল রিভার ক্রুজ টিকিটঃ ৭৫ থেকে ১৮০ ইউয়ান।



ইউশিও পার্ক

ইউশিও পার্কটি শহর গুয়াংজু শহরের বৃহত্তম পার্ক। ৮৬০,০০০ বর্গমিটার (২১২.৫ একর) এলাকা জুড়ে এটি তিনটি কৃত্রিম হ্রদ এবং উইশিও পাহাড়ের সাতটি চূড়া নিয়ে গঠিত। পার্ক রয়েছে অসংখ্য উদ্ভিদ এবং ফুল, পাশাপাশি রয়েছে বিনোদনের সকল ব্যবস্থা, নৌকা ভ্রমণের সুযোগ, সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, রেস্তোরা, স্টল, যাদুঘর ইত্যাদি। ইউশিও পার্কের পাঁচ-রাম ভাস্কর্যটি গুয়াংজুয়ের অন্যতম বিখ্যাত কাঠামো। এটি শহরের প্রতীক হয়ে উঠেছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, প্রায় ২,০০০ বছর পূর্বে, এই শহরটি এমন একটি অনূর্বর দেশ ছিল যারা কঠোর পরিশ্রম করেও দুর্ভিক্ষে ভুগছিল। একদিন পাঁচ রঙের পোশাকের পাঁচজন অমর ব্যক্তি তাদের কিংবদন্তি সংগীত বাজিয়ে পাঁচটি ভেড়ায় চড়ে এসেছিল। ভেড়াগুলি মুখে ধানের শীষ ধারণ করেছিল।

অমর লোকেরা স্থানীয় মানুষের জন্য ধানের শীষ রেখে শহরকে আশীর্বাদ দিয়ে চলে গেল। মেঘগুলি পাথরে পরিণত হয়েছিল এবং শহরটি একটি সমৃদ্ধ এবং জনবহুল জায়গায় পরিণত হয়েছিল। যার কারণে গুয়াংজু "সিটি অফ রামস" এবং "কান সিটি" এর নাম পেয়েছে।

উশিও পার্কে কীভাবে যাবেন?

মেট্রোলাইন ২ ইউশিও পার্ক স্টেশনে নেমে প্রস্থান করতে হবে বি ১ এক্সিট দিয়ে।

টিকিটঃ ফ্রি।

ন্যানিউ কিংয়ের পশ্চিম হান রাজবংশের জাদুঘর

উশিও পার্কের খুব কাছেই অবস্থিত এই বৃহত্তম হান বংশের দ্বিতীয় রাজা ঝাও মেই (২০৬ বি.সি থেকে ২৪ এ.ডি) এর সমাধিটি। এটি ২০ মিটার (৬৫.৬ ফুট) ভূগর্ভস্থে লুকানো। সমাধিটি রঙিন ম্যুরালগুলি সহ ৭৫০ বিশাল পাথর দ্বারা তৈরি। বিশ্বের ৮০ টি বিখ্যাত জাদুঘরের একটি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে এটি। এটিতে রয়েছে ১০ টি প্রদর্শনী হল। এর আয়তন ১৪,০০০ বর্গমিটার (১৫০, ৬৯৯.৬ বর্গফুট) জুড়ে রয়েছে।

ন্যানিউ কিংয়ের পশ্চিম হান রাজবংশের জাদুঘর কীভাবে যাবেন?

মেট্রোলাইন ২ তে যেয়ে ইউশিও পার্ক স্টেশনে নেমেই এক্সিট দিয়ে বের হয়ে ডান দিকে হাঁটতে হবে ২ মিনিটের মত।

খোলা থাকার সময়ঃ জাদুঘরটি খোলা থাকে ৯:০০ থেকে ১৭:৩০ পর্যন্ত এবং টিকিট কাটার সময় ৯:০০ থেকে ১৬:৪৫ পর্যন্ত।

টিকিটঃ ১২ইউয়ান।



সানইয়াত-সেন মেমোরিয়াল হল

সানইয়াত-সেন মেমোরিয়াল হলটি চীনা মহান বিপ্লবী নেতা সানইয়াত-সেনের স্মরণে নির্মিত। এটি অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। এটি ব্যবহার করা হত বিশাল সমাবেশ এবং পারফরম্যান্সের জন্য। মূল ভবনটি একটি অষ্টভুজাকৃতির প্রাচীন প্রাসাদ যা চীনা ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্যযুক্ত। হলটিতে সানইয়াত-সেনের পরিচয় এবং তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রাচীন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গুয়াংজু শহরের ৫ কালের পরিবর্তনের অবকাঠামো রয়েছে। এছাড়াও, উঠোনটিতে প্রাচীনতম কাপোকগাছ এবং শহরের দু'টি বৃহত্তম ম্যাগনোলিয়া গাছ রয়েছে।

সানইয়াত-সেনমেমোরিয়ালহল কীভাবে যাবেন?

মেট্রোলাইন ২ দিয়ে যেয়ে নামতে হবে মেমোরিয়ালহল স্টেশনে।

খোলা থাকার সময়ঃ এটিখোলা থাকে ৮:০০ থেকে ১৮:০০ পর্যন্ত।

টিকিটঃ ১০ ইউয়ান।

হোয়াইট ক্লাউড পর্বত (বায়ুন মাউন্টেন)

গুয়াংজু শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা প্রধান দর্শনীয় স্থান হল অন্যতম বিখ্যাত স্থান হল হোয়াইট ক্লাউড পর্বতমালা। এর আয়তন প্রায় ২৮ বর্গকিলোমিটার (১০বর্গমাইল), ৩০টি শৃঙ্গ নিয়ে গঠিত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মোক্সিংরিজ (স্টার-স্ক্র্যাপিংরিজ) এর উচ্চতা প্রায় ৩৮২ মিটার (৪১৭ গজ)। এর শিখরে দাঁড়িয়ে পুরো শহর এবং গুয়াংজুর সর্বাধিক বিখ্যাত নদী, পার্ল নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। এছাড়াও রয়েছে ছয়টি স্থান যেগুলো দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়; ব্রাইট পার্ল বিল্ডিং পার্ক, সান টেলিং সামিট পার্ক, বার্ড স্প্রিং ভ্যালি পার্ক (মিংচুন ভ্যালি), সান্টাইলিং পার্ক, লুহু পার্ক এবং ফেইলিং পার্ক।



হোয়াইট ক্লাউড পর্বত (বায়ুন মাউন্টেন) কীভাবে যাবেন?

মেট্রোলাইন ২ দিয়ে যেয়ে নামতে হবে বায়ুন কালচার স্কয়ার স্টেশনে নেমে সি এক্সিট দিয়ে বের হয়ে বের বাস স্টপ থেকে ৬৬০ নং বাসে করে যেয়ে ইউন্টাই হোয়াইউয়ান বাস স্টেশনে নামতে হবে। তার পর হাতের বাম পাশে দিকে ১০ মিনিট হেঁটে গেলে হোয়াইট ক্লাউড মাউন্টেন দক্ষিণ গেট।

টিকিটঃ ১০ ইউয়ান।

ইউন্টাইগার্ডেন

হোয়াইট ক্লাউড (বায়ুন মাউন্টেন) পর্বতের উত্তরের প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত ইউন্টাই গার্ডেন হল এক বিশাল আকারের ফুলের বাগান (প্রায় ১২০,০০০ বর্গমিটার)। এই বাগানের রাতের দৃশ্য সবচেয়ে বেশি মন মুগ্ধকর, কারন এত সুন্দর লাইটিং করা হয়েছে যা সত্যিই অসাধারণ। বছর জুড়ে এখানে দেখা মিলে নানা ফুলের সমারহ। সব চেয়ে বড় আকর্ষণ হল ফেব্রুয়ারির লক্ষাধিক টিউলিপ ফুলের প্রদর্শনী।



ইউন্টাই গার্ডেন কীভাবে যাবেন ?

মেট্রোলাইন ২ দিয়ে যেয়ে নামতে হবে বায়ুন কালচার স্কয়ার স্টেশনে নেমে সি এক্সিট দিয়ে বের হয়ে বের বাস স্টপ থেকে ৬৬০ নং বাসে করে যেয়ে ইউন্টাই হোয়াইউয়ান বাস স্টেশনে নামতে হবে।

খোলা থাকার সময়ঃ ইউন্টাই গার্ডেন খোলা থাকে ৯:৩০ থেকে ২১:০০ পর্যন্ত।

টিকিটঃ ৩০ ইউয়ান।



গুয়াংজু ভাস্কর্য উদ্যানঃ

গুয়াংজু স্কাল্পচার পার্কটি চীনের বৃহত্তম থিমপার্ক, যা ৪৬০০,০০০ বর্গমিটার (০.৪৬হেক্টর) এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এটি চারটি ভাগে বিভক্ত: ইয়াংচেং (গুয়াংজুডাকনাম) ইতিহাস ভাস্কর্য অংশ, বন অংশ, চীনা ইতিহাস অংশ, ভাস্কর্য শোপেস। এই পার্কটি ভাস্কর্য এবং বাগান শিল্পের সংমিশ্রণ। গুয়াংজু ভাস্কর্য পার্কের ভাস্কর্য গুলি কেবল ভাস্কর্য শিল্পের সৌন্দর্যই প্রদর্শন করে থাকে না, ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটে তুলেছে গুয়াংজুর তথা চায়নার সুস্পষ্ট ইতিহাস।

গুয়াংজু ভাস্কর্য উদ্যান কীভাবে যাবেন?

মেট্রোলাইন ৫ দিয়ে যেয়ে নামতে হবে শিয়াওবেই স্টেশনে নেমে ডি এক্সিট দিয়ে বের হয়ে বাস স্টপ থেকে ১৮৯ নং বাসে করে যেয়ে ভাস্কর্য উদ্যান বাস স্টেশনে নামতে হবে।

খোলা থাকার সময়ঃ উদ্যানটি খোলা থাকে ৬:৩০ থেকে ২১:০০ পর্যন্ত।

টিকিট : ফ্রি।



চেনক্লান একাডেমি

চেন পরিবারের পূর্বপুরুষদের মন্দির, যা চেনক্লান একাডেমি নামে পরিচিত। এটি ছিল চেন পরিবারের পূর্বপুরুষদের বলিদান এবং অধ্যয়ন উভয়ের জন্য স্থান। পরে এটি চেনক্লানের ইন্ডাস্ট্রি কলেজ এবং তারপরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। এখন এটি গুয়াংডং ফোক আর্ট যাদুঘর।

চেনক্লান একাডেমি কীভাবে যাবেন?

মেট্রোলাইন ১ দিয়ে যেয়ে চেনজিয়াচি স্টেশনে নামতে হবে তারপর প্রস্থান করতে হবে সি বা ডি এক্সিট দিয়ে।

খোলা থাকার সময়ঃ এটি খোলা থাকে ৯:০০ থেকে ১৭:০০ পর্যন্ত।

টিকিট : ১০ ইউয়ান।

নানশা মাজু মন্দির

বেইজিংয়ের ফরবিডন সিটির স্টাইলে তৈরি নানশা মাজু মন্দির সমুদ্রের দেবীর উপাসনা করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। এটিকে লোকেরা মাজু বা চীনা ভাষায় তিয়ানহু বলে, যার আক্ষরিক অর্থে স্বর্গীয় সম্রাজ্ঞী, যার আসল নাম লিনমো। মূর্তিটি প্রায় ১৪.৫ মিটার (প্রায় ৪৭.৬ ফুট) উঁচু এবং ৩৬৫ টুকরা গ্রানাইট দিয়ে তৈরি। গুয়াংজু নানশা আন্তর্জাতিক ব্রুজ হোমবন্দরটি ও এখানেই অবস্থিত।

নানশা মাজু মন্দির কীভাবে যাবেন?

মেট্রোলাইন ৪ দিয়ে যেয়ে নামতে হবে নানশা প্যাসেঞ্জার পোর্টস্টেশনে মে বি এক্সিট দিয়ে সোজা সামনের দিকে হেঁটে যেতে হবে ১৫ মিনিট।

খোলা থাকার সময় : মন্দিরটি খোলা থাকে ৯.০০ থেকে ১৭:০০ পর্যন্ত।

টিকিট : ২০ ইউয়ান।



ফারহানা গুচি (পিএইচডি গবেষক)

সাউথ চায়না ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি

গুয়াংজু, চায়না



চাইনিজ সালাদ রেসিপি

আমরা সবাই সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর চাইনিজ সালাদের কথা শুনেছি। কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারি না, আসলে কীভাবে খুব সহজেই চাইনিজ সালাদ তৈরি করা যায়। আসুন জেনে নেই এই সুস্বাদু চাইনিজ সালাদের রেসিপি:

উপকরণ

১. ১/২ চামচ মরিচের পেস্ট
২. ১/২ চামচ চিংড়ির গুড়ো পেস্ট
৩. ১/২ চামচ ভাজা চিনাবাদাম গুড়া
৪. ১/২ চামচ তেঁতুলের পানি
৫. ২ চামচ আদা কুঁচি
৬. ১/২ চামচ লেবু কুঁচি
৭. একটি আন্ত লেবুর রস
৮. ১/৪ কাপ গোল করে কাটা আনারস কুঁচি
৯. ১/৪ কাপ গোল করে কাটা শসা কুঁচি
১০. ১/৪ কাপ গোল করে কাটা কাঁচা আম কুঁচি
১১. ১/৪ কাপ মটরশুটি
১২. ১/২ কাপ রান্না করা জেলি মাছ
১৩. ১/৪ কাপ গমের আটা
১৪. ২ টি লেটুস পাতা
১৫. ১ থেকে চারটি পার্সলে



কীভাবে চাইনিজ সালাদ তৈরি করবেন

১. সমস্ত উপাদান ভাল মিশ্র করণ।
১. লেটুস পাতায় সালাদ নিন।
২. পার্সলে দিয়ে সজ্জিত করণ।
৩. ভুনা চিনাবাদাম দিয়ে শীর্ষে পরিবেশন করণ।

পুষ্টি তথ্যঃ চাইনিজ সালাদ বিভিন্ন রকমের সবজির ও ফলের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় যাতে প্রচুর পরিমাণ ডায়াটারি ফাইবার থাকে যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। তাছাড়া সালাদে ব্যবহার করা শাক-সবজি, ফলমূল এবং মশলাতে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ লবণ, এন্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইটো নিউট্রিয়েন্ট থাকে যা আমাদের দেহকে সুস্থ সবল রাখতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সালাদের আরেকটি কার্যকরী উপকারিতা হল এটি আমাদের শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে। তাই সবারই বেশি বেশি সালাদ খাওয়া উচিত।

লুবনা হোসেন লিয়া

চায়না ইউনিভার্সিটি অব মাইনিং অ্যান্ড টেকনোলজি



ফটোগ্রাফি



*Landscape, Shanghai University
Baoshan, Shanghai*



*Landscape of central library
of Shanghai University
Baoshan, Shanghai*



*Lake view, Shanghai University
Baoshan, Shanghai*

**PHOTOGRAPHY BY:
TANJIM TOMANNA**



**জীবিকার উপজীবিকায় জীবিকার
অনুমোদন.**



ঘাম-রক্ত নির্ভিক শ্রম



অন্ন যোগান-আন্দোলন

**PHOTOGRAPHY BY:
KAZI RAZOWAN AHMED**

BCYSA ক্যাম্পাস প্রতিনিধি বাছাইপর্বের ফলাফল প্রকাশ

BCYSA NEWS DESK: বাংলাদেশ-চীন ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের 'ক্যাম্পাস সংবাদদাতা ও ক্যাম্পাস প্রতিনিধি বাছাইপর্বের ফলাফল হস্তান্তর' শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার (১৫ ই নভেম্বর) বেইজিং সময় রাত ১০:৩০ মিনিটে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম VooV meeting এ অনুষ্ঠিত হয় সভাটি।

প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি জনাব মুজাহিদের নেতৃত্বে এবং সহ-সভাপতি মারুফ হাসানের পরিচালনায় প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলে এ সভা। সভায় চীন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগঠনটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ও নির্বাচকমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় নির্বাচকমণ্ডলী ফলাফল হস্তান্তরের পাশাপাশি একে একে নির্বাচিত প্রার্থীদের সম্পর্কে বর্ণনা দেন।

সভায় সকলের মধ্যে সংগঠনের সভাপতি ও অন্যান্য বোর্ড সদস্যরা বক্তব্য রাখেন। সভাপতি বলেন, 'অসংখ্য প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযোগ্য মূল্যায়ন শেষে চূড়ান্ত ফলাফল প্রদানে সকল নির্বাচক মণ্ডলীদের জানাই কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। আশাকরি নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ক্যাম্পাস প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ ক্যাম্পাসে BCYSA-কে প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং সংগঠনকে আরও গতিশীল করে চীনে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের স্বার্থ রক্ষা ও বন্ধুপ্রতিম দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন।' তিনি আরো বলেন, 'ক্যাম্পাসে সাংবাদিকতার মাধ্যমেই হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পান একজন সাংবাদিক। আশা করছি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক হয়ে দু'দেশের সম্ভাবনাময় দিকগুলো ভুলে ধরে বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করবেন ক্যাম্পাস সংবাদদাতাগণ।' তিনি জানান, 'ভবিষ্যতেও নিয়োগের এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।' যোগ্য এবং সৃজনশীলদের সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো গতিশীল করার আহ্বান জানান তিনি।

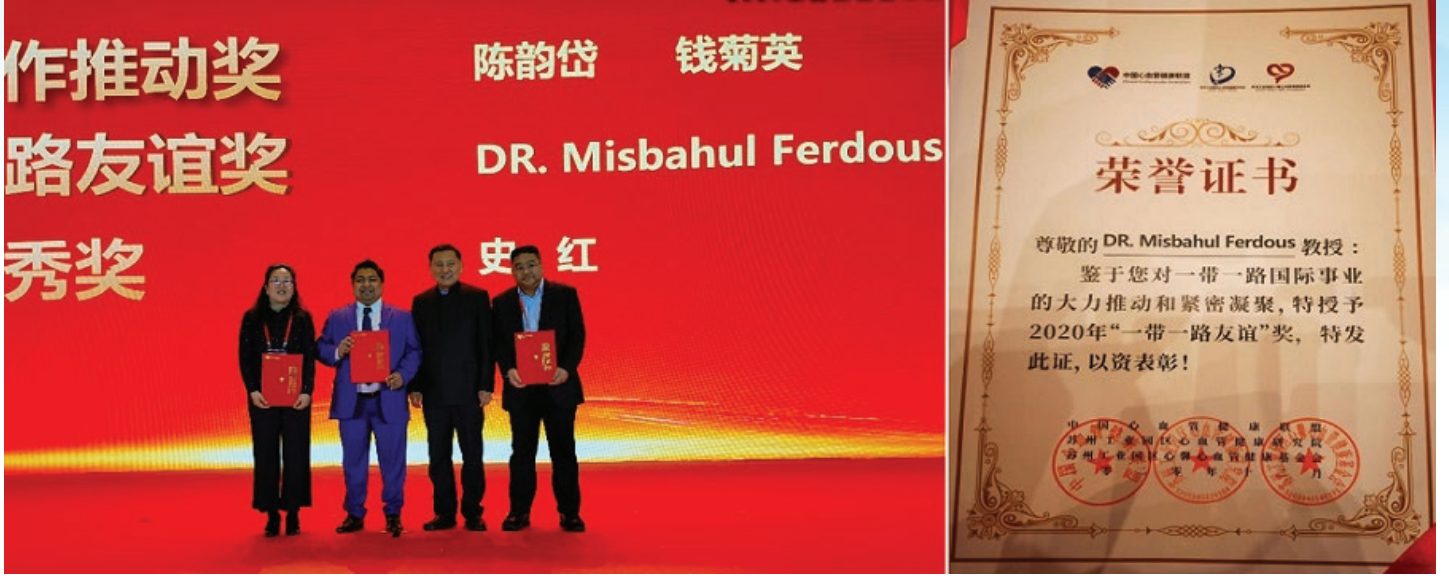
উল্লেখ্য, BCYSA গত ২২ শে অক্টোবর থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ শুরু করে। ১২০ জন আবেদনকারীর আবেদনের পরিক্রমিত গত ৩১ শে অক্টোবর সংগঠনটির ক্যাম্পাস সংবাদদাতা ও ক্যাম্পাস প্রতিনিধি বাছাইপর্ব শুরু হয়। নির্বাচকমণ্ডলীরা এদের মধ্য থেকে ৩৮ জনকে নির্বাচিত করেন।

আবেদনপত্র মূল্যায়ন এবং ভারুয়াল সাক্ষাতের মাধ্যমে বাছাইপর্বে নির্বাচক হিসেবে ছিলেন ইফতে খাইরুল হক ইমন, নুজহাত ফারহানা, অজয় কান্তি মণ্ডল, মোঃ খাইরুল ইসলাম, পলাশ আহমেদ, আকিব ইরফান ও মোঃ রিশাদ আহমেদ।

BCYSA Campus Team

Full Name	University Name	Email Address	Position
Md Sabbir Ahmed	Anhui University Of Technology	gnsharifk@gmail.com	Campus Representative
Saha Shemon	Capital Medical University	shemon.saha000@gmail.com	Campus Representative
Md Mizanur Rahman	Changdu Technological University	mizanurrahman@qq.com	Campus Representative
Md Fahim Shahriar	China Pharmaceutical University	mfsa1999@gmail.com	Campus Representative
Md Rajon Molla	Dalian University Of Foreign Languages	rajonmolla57@gmail.com	Campus Representative
Mohammad Khalid Shahriar	Hangzhou Dianzi University	shahriarshuvo01@outlook.com	Campus Representative
Khurshid Alam	Hebei University Of Science And Technology	khurshid0008800@gmail.com	Campus Representative
Md Hasanul Kabir	Henan Polytechnic University	hasanul.kabir09@outlook.com	Campus Representative
Parvez Mohammad Shariar	Hubei University Of Technology	masptonoy@gmail.com	Campus Representative
Md Sabbir Hasan Joy	Jiangsu Normal University	oscarjsnu@gmail.com	Campus Representative
Sheikh Thounidul Islam	Jiangsu Polytechnic College Of Agriculture And Forestry	sheikthouthidu1222@gmail.com	Campus Representative
Md Jahangir Alam	Jiangsu University Of Science And Technology	engr.mdjahangiralam@gmail.com	Campus Representative
Mir Abdur Rob	Jiangxi University Of Technology	amir999@yahoo.com	Campus Representative
Syeda Fabiha Islam	Jinghu University Of Technology	fabihaislam911@gmail.com	Campus Representative
Dipto Kumar Mondol	Nanjing University Of Information Science And Technology	himel@gmail.com	Campus Representative
Abdullah Al Bary Voban	Nanjing University Of Information Science And Technology	baribhuban@gmail.com	Campus Representative
Md Eahiya Hasan Sujat	Ningxia Medical University	eahiyaahasansujat@gmail.com	Campus Representative
Md Tauhidul Islam	Sichuan University	tanhidscul6@gmail.com	Campus Representative
Abul Khair	Southwest Petroleum University	abulkhair211995@gmail.com	Campus Representative
S M Salman Sakib	Tiangong University	salmansakib22@gmail.com	Campus Representative
Islam Md Tarikul	Tianjin University	rayontarikul@gmail.com	Campus Representative
Shahiduzzaman	Tongji University	officialwahiduzzaman@gmail.com	Campus Representative
Md Sohrab Ali	Yangzhou University	schrabali4047@gmail.com	Campus Representative
Mohammad Wahiduzzaman	Yanshan University	wahiduzzamanofficial@gmail.com	Campus Representative
Farjana Islam	China Academy of Art	farjanababy509@gmail.com	Campus Representative
Farhana Najrine	South China University of Technology	shuchi.bau@outlook.com	Campus News Correspondent
Moin Uddin Helaty Thounid	Southwest Petroleum University	helatythounid@gmail.com	Campus News Correspondent
Riyad Hossen	Nanjing Vocational College of Science and Technology	brhossen785@gmail.com	Campus News Correspondent
Abdul Karim Patwary	Southwest Petroleum University	abdulkarimpatwary20@gmail.com	Campus News Correspondent
Md Mostafijur Rahman	Sichuan Agricultural University	rifat143@hotmail.com	Campus News Correspondent
Rabiu Awal	Huayin Institute of Technology	rabiul123112@gmail.com	Campus News Correspondent
Farzana Fatima Liza	Lanzhou University	farzanaliza07@gmail.com	Campus News Correspondent
Hasan Ammarul	Yangzhou University	ammar244340@gmail.com	BCYSA Expert Team Member
S M Zubayer	Hubei University Of Technology	smzubayer18@gmail.com	BCYSA Expert Team Member
Mehe di Hasan Tuhin	Hubei University Of Technology	mehedihassin5492@gmail.com	BCYSA Expert Team Member
Md Sazzit Hossen	Southwest Petroleum University	sazzithossen@gmail.com	BCYSA Expert Team Member
Minhazul Arefin	Southwest Petroleum University	marefin222@gmail.com	BCYSA Expert Team Member
Md Foyezur Rahman	Jiangsu University Of Science And Technology	ronyfoyezurrahman@gmail.com	BCYSA Expert Team Member

বাংলাদেশি চিকিৎসকের বেল্ট এন্ড রোড ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড অর্জন



প্রথম কোনো বাংলাদেশি হিসেবে বেল্ট এন্ড রোড ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন বাংলাদেশি চিকিৎসক মিসবাউল ফেরদৌস। করোনা প্রাদুর্ভাবের সময়ে চীনের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ায় সম্মানসূচক এ পুরস্কার প্রদান করা হয় তাকে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় সম্মেলন কেন্দ্রে বেইজিং-এ 'চায়না কার্ডিওভাস্কুলার হেলথ ২০২০' শীর্ষক সম্মেলনে তার হাতে তুলে দেয়া হয় এ পুরস্কার।

এ বছরের শুরুর দিকে করোনা মহামারী চীনে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায়, পুরো চীন জুড়ে মেডিকেল সরঞ্জামাদি সংকট দেখা দেয়। এসময় সৌদি আরবে 'আইএমসি লাইভ-৮' সম্মেলনে ছিলেন বেইজিংয়ের ফুওয়াই হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ডাঃ মিসবাউল ফেরদৌস।

ডাঃ মিসবাউল ওইসময় নিজস্ব অর্থায়নে সৌদি আরবের প্রায় ১৪ টি মেডিকেল স্টোর থেকে মাস্ক সংগ্রহ করে বেইজিং এ ফিরে আসেন। এগুলো তিনি চীনের বেইজিং, শ্যানডং, ছিংছিং, কুনমিং, নিংশিয়া, সিচুয়ান ও আনহুই প্রদেশে বিতরণ করেছিলেন। এরপরে তিনি পর্যায়ক্রমে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ থেকে আরো ৩২ হাজার মাস্ক কিনে চীনের উহান (১৬ হাজার), সাংহাই, শেনচেন ও ছিংছিং প্রদেশে বিতরণ করেন।

এছাড়াও তিনি বাংলাদেশে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় হাসপাতালগুলোর জরুরী পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। চীনের প্রথম সারির তিনটি সংগঠন ও কয়েকজন চীনা ডাক্তারের সহযোগিতায় দেশের সংকটকালীন মুহূর্তে ১০০ টি সুরক্ষা স্যুট, ১০০টি চশমা, ৪৫০টি ফেস-শিল্ড, চার হাজার সার্জিক্যাল মাস্ক ও ৬০০ এন-৯৪ মাস্ক চীন থেকে পাঠিয়েছিলেন ডাঃ মিসবাউল।

আত্মমানবতার সেবায় বিরল এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বাংলাদেশি এই চিকিৎসক। ডাঃ মিসবাউল ফেরদৌসের জন্ম বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। তিনি চীনের শ্যানডং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

ডাঃ মিসবাউল এশিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলজি (ASC) এর সহ-সভাপতি। এছাড়াও তিনি এবছর এশিয়া প্যাসিফিক প্রাইমারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন (APPHA) এর ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আগামী ৬ বছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন।

প্রতিবেদকঃ ইফতে খাইরুল হক ইমন

সায়েন্টিফিক পেপারের সংখ্যার দিক দিয়ে আমেরিকাকে টপকালো চীন

ইফতে খাইরুল হক ইমনঃ সম্প্রতি জাপানের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি পলিসি কর্তৃক একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চীন ন্যাচারাল সায়েন্সে ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি একাডেমিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করে প্রথমবারের মতো তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি এবং তালিকার চতুর্থ স্থান দখল করেছে জাপান।

জাপানভিত্তিক এ প্রতিবেদন সংস্থা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে প্রকাশিত প্রায় দশ হাজার ন্যাচারাল সায়েন্স সম্পর্কিত গবেষণাপত্র বিশেষণ করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনে দেখা যায় ৩০৫,৯২৭ টি সায়েন্টিফিক পেপার (১৯.৯%) চীনকে তালিকার শীর্ষে রেখেছে। এদিকে, আমেরিকা ২৮১,৪৮৭ টি পেপার (১৮.৩%) নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

এছাড়া জার্মানি ৬৭,০৪১ টি (৪.৪%) এবং জাপান ৬৪,৮৭৪ টি (৪.২%) গবেষণাপত্র নিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করেছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে ব্রিটেন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, ফ্রান্স এবং কানাডা।

		Number of Papers	Share
1	China	305,927	19.9%
2	United States	281,487	18.3%
3	Germany	67,041	4.4%
4	Japan	64,874	4.2%
5	Britain	62,443	4.1%
6	India	59,207	3.9%
7	South Korea	48,649	3.2%
8	Italy	46,322	3.0%
9	France	45,387	3.0%
10	Canada	41,071	2.7%

	Number of Researchers
China	1,870,000
United States	1,430,000
Japan	680,000
Germany	430,000
South Korea	410,000

	Total R&D Expenses (¥ trillion)
United States	60.7
China	58.0
Japan	17.9
Germany	14.8
South Korea	10.3

এদিকে বিগত বছরগুলোর তুলনায় জাপানের রেংকিং একধাপ নিচে নেমে এসেছে বলে জানায় সংস্থাটি। শীর্ষস্থানে থাকা দুটি দেশের গবেষকদের মোট সংখ্যা ছিল ১.৮৭ মিলিয়ন (চীন) এবং ১.৪৩ মিলিয়ন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

২০১৮ এর হিসাবে মোট গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বরাদ্দ ছিল ৬১ ট্রিলিয়ন, চীনের ৫৮ ট্রিলিয়ন, জাপানের প্রায় ১৮ ট্রিলিয়ন, জার্মানির প্রায় ১৫ ট্রিলিয়ন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ১০ ট্রিলিয়ন।

তথ্যসূত্রঃ Nippon

BCYSA বেল্ট অ্যান্ড রোড ট্রেনিং একাডেমির যাত্রা শুরু

BCYSA NEWS DESK: সম্প্রতি বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন "বেল্ট অ্যান্ড রোড ট্রেনিং একাডেমি" নামক একটি অ-বাণিজ্যিক এবং অলাভজনক অনলাইন প্রশিক্ষণ একাডেমি চালু করতে যাচ্ছে। যেখানে সম্পূর্ণরূপে মাতৃভাষা বাংলায় কোর্স পরিচালনা করা হবে।

ট্রেনিং একাডেমির পরিচালনায় আছেন, পরিচালক ডক্টর কিশোর কুমার বিশ্বাস (উপদেষ্টা, BCYSA এবং পরিচালক, হুয়াওয়ে গোবাল ট্রেনিং সেন্টার, চীন) ও সেক্রেটারি ডাঃ মাহজাবিন তাবাসসুম (এমবিবিএস, সুবৌ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল এডভাইজর, সাংহাই টংটা কোম্পানি)।



BCYSA Belt & Road Training Academy

চীনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী কিংবা পূর্বে চীনে অধ্যয়নরত ছিলেন, তারা এই প্রশিক্ষণ সেশনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। মূলত শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সংগঠনের এই আয়োজন। BCYSA বিশ্বাস করে, এই অনলাইন প্রশিক্ষণ একাডেমি একজন মানসম্মত একাডেমিক স্কলার, ভালো উদ্যোক্তা এবং সার্বিক দিক দিয়ে দক্ষ হওয়ার পথ আরও সহজ করে দেবে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হিসেবে থাকবে চীনা ভাষা এবং সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, একাডেমিক গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণাপত্র প্রকাশের গাইড লাইন, জব হান্টিং, উদ্যোক্তা তৈরি, চীনে ব্যবসায়ের সুযোগ, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, প্রশিক্ষণ একাডেমি একাডেমিক এবং পেশাদার উভয়েই গুরুত্বের সাথে দেখছে।

প্রথমত BCYSA এর প্রশিক্ষণ সেশন এবং ওয়েবিনারগুলি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক অভিজ্ঞতা বাড়াতে সহায়তা করবে, যেমন একাডেমিক অসুবিধা, গবেষণাপত্র পরিচালনা, গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ এবং আরও নানাবিধ একাডেমিক কার্যকলাপ।

এরপর একটি দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে BCYSA বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় পেশাদারদের আমন্ত্রণ জানাবে, যারা শিক্ষার্থীদের গাইড করার পাশাপাশি তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবে। উল্লেখ্য, ট্রেনিং সেশনগুলো মূলত চাইনিজ পাবলিক ছুটির দিন কিংবা দীর্ঘ হলে শীত কিংবা গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে সম্পন্ন হবে।



চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিষে আলোচনার জন্য চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এর বাংলাদেশ টিভি স্টেশনে সাক্ষাৎকার

২৭শে সেপ্টেম্বর চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৪৫ তম বার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এবং চীনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহবুব উজ্জামানকে সিসিটিভির বাংলাদেশ রিপোর্টার স্টেশনে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এটি বাংলাদেশের টিভি স্টেশন আরটিভিতে দেখান হয়েছিল টক শো "চীন অন ফোকাস" নামের শিরোনামে।

রাষ্ট্রদূত লি বলেছেন যে, এ বছর মহামারীর কারণে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে মতবিনিময় পারস্পরিক সহায়তায় নতুন ফলাফল যুক্ত করেছে। এটি পারস্পরিক সহায়তার নতুন অভিব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক প্রকাশের জন্য চিঠিপত্র বিনিময় করেছেন। এছাড়াও তারা ফোন কল আদান প্রদান করেছেন।

রাষ্ট্রদূত লি বলেছেন যে ২০১৬ সালে জেনারেল সেক্রেটারি শি জিনপিয়ের সফল বাংলাদেশ সফর হওয়ার পর থেকে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়ন দ্রুত গতিতে প্রবেশ করেছে। চীন-বাংলাদেশ পরস্পরের সহযোগিতায় বিশাল পরিমাণে তহবিলের যোগান দিয়েছে। উচ্চ প্রকল্প বাস্তবায়ন দক্ষতা, স্বল্প প্রকল্প ব্যয়, উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত মূল্য এবং নিখরচায় শর্ত ছাড়া বাংলাদেশের জনগণের উপকারের মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। এছাড়াও চীন সম্ভব বাংলাদেশ-চীন বন্ধুত্ব সেতুর প্রথম বাংলাদেশ-চীন বন্ধুত্ব সেতু, সান ইয়াত-সেন আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রসহ বাংলাদেশে বিভিন্ন বৈষয়িক সহায়তা, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রকল্প সহায়তা প্রকল্পের সম্পূর্ণ সেট বাস্তবায়ন করেছে।

রাষ্ট্রদূত লি ইঙ্গিত করেছিলেন যে, বাংলাদেশ "বেল্ট অ্যান্ড রোড" উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ নোড দেশ। বাংলাদেশের স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশাল জনসংখ্যার লভ্যাংশ, মৌলিক পণ্যের স্থিতিশীল দাম, উচ্চতর ভৌগলিক অবস্থান এবং তুলনামূলকভাবে ভাল জননিরাপত্তা পরিবেশ। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য তার উন্নত সুবিধা রয়েছে।

সাক্ষাৎকার চলাকালীন, চীনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহবুব উজ্জামান বলেছিলেন যে, মহামারী চলাকালীন বাংলাদেশ ও চীন সরকার এবং সমাজের সমস্ত সেক্টর একে অপরকে দেখেছেন। তারা পরস্পরকে সহায়তা করেছেন, যা দুই দেশের ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করে। "২০২১ এর দৃষ্টিভঙ্গি" উপলব্ধি করার বাংলাদেশের দৃঢ় সংকল্প এবং চীন একটি পরিমিত সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের ব্যাপক জনগণের প্রতি এর দৃঢ়প্রতিশ্রুতিও প্রদর্শন করে। এই প্রোগ্রামটি ৩০শে সেপ্টেম্বর একই সময়ে আরটিভি, ফেসবুক এবং ইউটিউবে প্রচারিত হয়।

সূত্রঃ বাংলাদেশ চীনা দূতাবাস